Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.3
Pages	২৭-৫১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব

Check for updates

মোহাম্মদ আজম*

১. পাঠপরিধি

মিখাইল বাখতিনের (১৮৯৫-১৯৭৫) উপন্যাসতত্ত্ব তাঁর নন্দনতত্ত্বই বটে। ইতিহাসের লম্বা পরিক্রমায় আর জীবনের ছোট-বড়-মাঝারি সংখ্যাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি উপন্যাস নামের সাহিত্যরূপের তত্ত্বতালাশ করেছেন। সেখানে ইতিহাসে-জীবনে-উপন্যাসে কোনো জল-অচল ফারাক তৈরি হয়নি। বাখতিনের ক্ষেত্রে উপন্যাসতত্ত্ব এ কারণে তাঁর জীবনতত্ত্বেরই বিশেষ প্রকাশ মাত্র।

তিনি নিজে অবশ্য দর্শন বা জীবনদর্শন প্রণয়নের দাবি তোলেননি। উপন্যাসের রকম-সকমই কেবল বুঝতে চেয়েছেন। তবে তাঁর দাবি ছোট নয়। তাঁর মতে, এ যাবৎ উপন্যাস-বিশ্লেষকেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কাজ করেছেন বিশেষ ধরনের উপন্যাস বা কোনো বিশেষ লেখকের উপন্যাস নিয়ে। কাব্যতত্ত্বের প্রচলিত ভাষা-অনুমান-পদ্ধতি ব্যবহার করেই তাঁরা কাজটা করেছেন। সমস্যা হয়েছে সাকুল্যে দুটো, যার কোনোটিই নগণ্য নয়। এক. সাহিত্যরূপ হিসাবে উপন্যাস আলাদা কোনো সামগ্রিক সংজ্ঞা পায়নি; দুই. উপন্যাস পড়ার জন্য জরুরি আলাদা কলাকৌশল বা পদ্ধতি তৈরি হয়নি। বাখতিন নিজে তাঁর প্রায় সমগ্র রচনায় এ কাজ দুটিই করতে চেয়েছেন।

কাজটা তিনি করেছেন ভাষাকে কেন্দ্রে রেখে এবং ভাষাকে অবলম্বন করে। ভাষাকে দেখেছেন জীবনের বৈচিত্র্য ও সমগ্রতার লীলাক্ষেত্র হিসাবে। ইউরোপীয় ইতিহাসের লম্বা পাটাতনে জীবন ও ভাষার পারস্পরিকতা আবিষ্কার করেছেন তাঁর বিশদ কথামালায়। আর ভাষায় জায়মান বহুবিচিত্র জীবনের যথার্থ আধার হিসাবে পাঠ করেছেন উপন্যাস। বাখতিনের উপন্যাসদর্শন এ কারণে তাঁর ভাষাদর্শন আর জীবনদর্শনও বটে।

বর্তমান নিবন্ধ বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক পাঠ নয়, আংশিক পরিচয়জ্ঞাপক পাঠ। তাঁর বিপুল লেখালেখির[১] মধ্যে প্রধানত *The Dialogic Imagination : Four essays* (1994) এবং গৌণত *Problems of Dostoevsky's Poetics* (1999) এই পাঠে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. উপন্যাস : নতুন সংজ্ঞার খোঁজে

বাখতিনের লেখালেখিতে উপন্যাস কথাটি কমপক্ষে তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক. 'আধুনিক' জমানায় বিকশিত যে সাহিত্যরূপটি সাহিত্যতত্ত্বে বা সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস নামে পরিচিত; দুই. উপন্যাসের বাখতিন-বর্ণিত আদর্শ রূপ, দস্তয়েভস্কির

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপন্যাসে যার সন্ধান পাওয়া যায়; তিন. ভাষার শৈল্পিক উপস্থাপনার এক বিশিষ্ট ধরন, যা গ্রেকো-রোমান নানা দৃষ্টান্তে বা লোকসাহিত্যে অনেক আগে থেকেই চর্চিত হয়েছে।

তবে যে অর্থেই 'উপন্যাস' শব্দটি ব্যবহৃত হোক না কেন, বাখতিন এ বিষয়ে অন্যদের সাথে একমত যে, সাহিত্যরূপ হিসাবে উপন্যাসের প্রবল উত্থান ঘটেছে আধুনিক কালে। কয়েক ধাপ এগিয়ে তিনি আরো দাবি করেছেন, উপন্যাসই আমাদের কালের একমাত্র সাহিত্যরূপ। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের একালে অন্য সাহিত্যরূপগুলোও কম-বেশি উপন্যাসিত (Novelized) হয়েছে (Bakhtin, 1994 : 7)।

উপন্যাস এখনো বিকাশমান। এর সম্ভাবনাগুলো নিঃশেষে ব্যবহৃত হয়নি। মহাকাব্য বা ট্র্যাজেডির মতো অধিকাংশ সাহিত্যরূপ শুধু পুরানাই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিকও বটে। এগুলোর বেশিরভাগই আবির্ভূত ও বিকশিত হয়েছে লিখনশৈলী আর পুস্তকের আবির্ভাবের আগে। আধুনিক জমানার আগেই এগুলোর রূপ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উপন্যাসই একমাত্র ব্যতিক্রম। অন্য সাহিত্যরূপ-পাঠ মৃতভাষা পাঠের মতো; উপন্যাসপাঠ শুধু জীবিত ভাষার মতোই নয়, এমন এক ভাষার পাঠ, যা এখনো তরুণ।

একালে পুরানা সাহিত্যরূপগুলো যখন নতুন করে লেখা হয়েছে, তখন সেগুলো নতুন জমানার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে—কখনো ভালো হয়েছে, কখনো মন্দ। যেমন, উপন্যাসের প্রভাবে অন্য সাহিত্যরূপগুলোও সংলাপায়িত (Dialogized) হয়েছে; হাসি, ব্যাজস্তুতি, ঠাট্টা ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, উপন্যাসের প্রভাবে এ সাহিত্যরূপগুলোতে 'অনিরূপিত' বৈশিষ্ট্য ঢুকেছে, অর্থের মুক্তি ঘটেছে এবং সমকালীন বাস্তবতা—যে বাস্তবতা চলমান, এখনো শেষ হয়নি — গ্রাহ্য হয়েছে। যুগের প্রধান সাহিত্যরূপ হয়ে ওঠার এই অভিযানে উপন্যাস অন্য সব রূপের নবায়ন ঘটিয়েছে — বিশেষত তাদের রচনা-প্রক্রিয়া আর বাস্তবের সবকিছু আত্মীকরণের দিক থেকে। দুর্ভাগ্যের কথা, সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা উপন্যাস আর পুরাকালে বিকশিত সাহিত্যরূপগুলোর মধ্যকার লড়াইকে সীমিত করে 'ঘরানা' বা 'প্রবণতা'র মধ্যে নিয়ে আসেন। উপন্যাসিত একটি কবিতাকে, ধরা যাক, তাঁরা বলেন 'রোমান্টিক' কবিতা। অবশ্যই এটা রোমান্টিক। কিন্তু এ পর্যন্ত বললেই কথা শেষ হয়ে যায় না। সাহিত্য ও ভাষার যে নিয়তি একালে অনিবার্য হয়ে উঠেছে তার তুলনায় এই 'ঘরানা' দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণির চরিত্র মাত্র।

অন্য সাহিত্যরূপগুলোকে উপন্যাসিত করার মানে এ নয় যে, অন্যগুলোর পাশে উপন্যাস নামের এক নতুন বর্গ যুক্ত হল। আদতে উপন্যাসের সেরকম নির্দিষ্ট কায়দা-কানুনই নাই। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এটি নির্দিষ্ট রীতিবিহীন, নমনীয়। উপন্যাস চির-নিরীক্ষাশীল। এটি নিজেকে নিয়েই পরীক্ষা করে এবং নিজের যে কোনো প্রতিষ্ঠিত রীতিকে পরীক্ষার অধীন করে রাখে। ক্রম-পরিবর্তমান বাস্তবতার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি সাহিত্যরূপের জন্য এর বিকল্পও নাই। ফলে অন্য সাহিত্যবর্গের উপন্যাসায়ন মানে উপন্যাস নামের ভিন্ন এক বর্গের অধীন হওয়া নয়; বরং উপন্যাসিত হওয়া তাদের নিজেদেরই মুক্তি ঘটায় — তাদের বিধিবদ্ধ উদ্ভব-বিকাশ থেকে, সেসব বৈশিষ্ট্য থেকে যা তাদের পুরানা করে রেখেছিল। চলতি যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল।

উপন্যাসের এই অনির্দিষ্ট গড়ন আর প্রবণতার বৈশিষ্ট্যসূচক আলোচনার জন্য বাখতিন মহাকাব্যের সাথে এর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন (Bakhtin, 1994 : 12-40)।

৩. উপন্যাস ও মহাকাব্য

উপন্যাস ও মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করলেও ঠিক এ দুটি রূপই বাখতিনের লক্ষ্য ছিল না। এ আলোচনায় তিনি উপন্যাস বলতে বুঝিয়েছেন উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্যকে। পুরানা নিরূপিত সাহিত্যরূপগুলোর পাশাপাশি এগুলো আদিকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। ওই পুরানা সাহিত্যরূপগুলোর আদর্শ প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে মহাকাব্য। শব্দ দুটো এখানে সংজ্ঞা-জ্ঞাপক নয়, বৈশিষ্ট্যবাচক।

মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য : এক. মহাকাব্যের বিষয় জাতীয় অতীত; দুই. জাতীয় ঐতিহ্য মহাকাব্যের উৎস, ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নয়; তিন. মহাকাব্যিক দূরত্ব বর্তমান বাস্তবতা থেকে — যে বাস্তবতায় গায়ক বা কবি বা পাঠক অবস্থান করে —মহাকাব্যিক জগৎকে আলাদা করে। পুরানা সাহিত্যে, বিশেষত মহাকাব্যে, অভিজ্ঞতা নয়, স্মৃতিই ছিল সৃজনশীল অনুপ্রেরণা-অনুভবের উৎস আর শক্তি। যা ছিল, তার পরিবর্তন অসম্ভব। অতীত ঐতিহ্য অপরিবর্তনীয় — পবিত্র। বিপরীতে উপন্যাস অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আর ভবিষ্যৎমুখী জীবনচর্চার ফসল।

মহাকাব্যের বিষয় 'চূড়ান্ত অতীত' (absolute past), পবিত্র জাতীয় স্মৃতি — আর এর ভাষাও ঐতিহ্যগত। মৃতদের সম্পর্কে আমরা ভিন্ন ভাষায় কথা বলি। অতীত নিরূপিত। তার ভাষাও নিরূপিত। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচরণ, নায়কের কথা, নায়ক-সম্পর্কিত বয়ান — সবই সেখানে ভিন্ন। নির্দিষ্ট। ধ্রুপদী। মহাকাব্য রচিত হয় দূরবর্তী ইমেজে। যে বর্তমান অপূর্ণ — হয়ে উঠছে এমন, পুনর্বিচারযোগ্য — তার সাথে মহাকাব্যের কার্যকারণগত কোনো সম্পর্ক নাই।

মহাকাব্য সম্পর্কে উপরে যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল, তা মোটাদাগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্য সাহিত্যরূপগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সময়ের সেই একই ব্যবহার, ঐতিহ্যের সমরূপ ভূমিকা, একই মহিমান্বিত দূরত্ব। সমকালের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নাই। সমকালীন ঘটনা বা চরিত্র যদি গৃহীত হয়ও, তাহলেও সেগুলো অতীতের নিশ্চয়তা-সম্পন্নতা নিয়েই হাজির হয়, বর্তমানের মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার, বাখতিনের রচনায় এই 'অতীত' আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক অর্থের অতীত নয়, বরং এটি সময়ের বিশেষরকম মহিমান্বিত ও দূরবর্তী বর্গ।

অন্যদিকে উপন্যাসের ময়দান এক বাস্তবলিপ্ত অনিরূপিত বর্তমানের জগৎ, যেখানে মিলিত হতে পারে অভিজ্ঞতার বিচিত্র তল, ভাষা, মতাদর্শ আর দৃষ্টিভঙ্গির বহু রূপ। এই মিলনক্ষেত্রে এসে জোটে সাহিত্য-বহির্ভূত নানা উপাদানও — প্রাত্যহিক জীবন আর আদর্শিক নানা উপাদান। হয়ত নৈতিক স্বীকারোক্তি, দার্শনিক রচনা, রাজনৈতিক ইশতেহার ইত্যাদিও। উন্মেষের কালেই উপন্যাস ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাস্তবের এ রকম সাহিত্য-

বহির্ভূত নানা রূপে হাত পেতেছিল। পরের ধাপে চিঠি, ডায়েরি, আত্মস্বীকারোক্তি, কোর্টের বয়ান ইত্যাদিও ব্যবহার করেছে।

সাহিত্য বা সাহিত্য-বহির্ভূত রচনা কিংবা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের সংজ্ঞা আসমান থেকে নাজেল হয় না, বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের আওতার মধ্যেই পরিবর্তনটা ঘটে — বিশেষ রূপ চিহ্নিত হয়। ক্রমবিকাশমান রূপ হিসাবে অন্য যে কোনো রূপের চেয়ে উপন্যাসেই পরিবর্তনটা ভালোভাবে ধরা পড়ে। একই কারণে সাহিত্যের অনির্ণীত ভবিষ্যৎও উপন্যাসের গতিবিধি থেকেই আঁচ করা সম্ভব।

এই পরিবর্তনটা সবচেয়ে ভালো ধরা পড়ে ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে। মহাকাব্য বা ট্র্যাজেডির ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত ব্যক্তি। সে শুরু থেকে যাবতীয় গুণ ও ক্ষমতার আধার। সেগুলো পরিপূর্ণরূপে ব্যবহারেও সে সক্ষম। তার ভিতর এবং বাইরের মধ্যে কোনো ফারাক থাকে না। তার দৃষ্টিভঙ্গিই তার জনসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি; একই সঙ্গে কাহিনির গায়ক ও শ্রোতারও দৃষ্টিভঙ্গি। পরিপূর্ণতাই তার আদর্শ। এই পূর্ণতা এতই প্রকাশ্য, ভিতর-বাহির এমনই একাকার যে, তার নিজের সম্পর্কে নিজের ভাষ্য এবং তার সম্পর্কে অন্যের — রচয়িতার — ভাষ্যে কোনো তফাত থাকে না। খোঁজাখুঁজির বালাই নাই, অনুমানের সুযোগ নাই, বাড়তি কিছু প্রকাশের ফুরসত নাই। মহাকাব্যের নায়ককে কোনো মতাদর্শিক-ভাবাদর্শিক খোঁজাখুঁজিও করতে হয় না। মহাকাব্যিক জগৎ একক একীভূত বিশ্বদৃষ্টির জগৎ — নায়কের মতো কবি আর শ্রোতার জন্যও। এমনকি দেবতারাও এই নিরূপিত সত্যের অধীন। এসব বৈশিষ্ট্যই মহাকাব্যসহ সুদূর অতীতের অন্য সাহিত্যরূপগুলোর অমিত সৌন্দর্য, পূর্ণতা, স্বচ্ছতা এবং শৈল্পিক সম্পন্নতার উৎস। আবার একই কারণে পরিবর্তিত মানব-অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণে তাদের ব্যর্থতা।

উপন্যাসের একটি গভীর বৈশিষ্ট্য এই যে, নায়কের অবস্থান এবং ভাগ্য তার সমগ্র অস্তিত্ব নির্দেশ করে না। তাতেই সে নিঃশেষ হয়ে যায় না। ব্যক্তি এখানে তার নিয়তির চেয়ে হয় বড়, নয়ত মানুষ হিসাবে তার অবস্থানের চেয়ে ছোট। কেরানি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, প্রেমিকা, আবেগী ঈর্ষাকাতর প্রেমিক, পিতা — এরকম পরিচয়ই তার একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। নায়ক যদি এরকম হয়, অর্থাৎ সে যদি তার অবস্থা-অবস্থান-ভাগ্যেই সমর্পিত হয় — যেমনটা হয় পুরানা সাহিত্যরূপগুলোতে বা উপন্যাসের গৌণ চরিত্রে — তাহলে অন্য প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানবিক বৈশিষ্ট্যের অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হবে। উপন্যাসের পাটাতন বিচিত্র বর্তমানের এবং একই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতেরও প্রকৃত মিলনক্ষেত্র। এই বৈচিত্র্যের চাপেই উপন্যাসের ব্যক্তি সবসময় একই বৈশিষ্ট্যে থাকতে পারে না। তার বিশেষ বা প্রধান পরিচয় সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে না।

মহাকাব্যিক বা ট্র্যাজিক চরিত্রের পূর্ণতা উপন্যাসে আরেকভাবে নষ্ট হয়। ব্যক্তির অন্তর্জগৎ-বহির্জগতের টানাপড়েনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধার হয়ে ওঠে। ব্যক্তিকে দেখার বিভিন্ন দিক — ব্যক্তির নিজের বিবেচনা এবং অন্যের দৃষ্টিতে ব্যক্তিকে

দেখা — পূর্ব-নির্ধারিত ছক ভেঙে দেয়। এভাবে ব্যক্তিচরিত্র প্রবেশ করে নতুন এক উচ্চতায়, মহাকাব্য বা ট্র্যাজেডির চরিত্রের একরোখা শৃঙ্খলার বিপরীতে প্রবেশ করে এক নতুন, অন্যরকম জটিল সমগ্রতায়।

অনিঃশেষ বর্তমানকে শৈল্পিক-মতাদর্শিক জায়গা থেকে আরম্ভবিন্দু হিসাবে নিতে পারা মানুষের সৃষ্টিশীল চৈতন্যের বৈপ্লবিক ধাপ। ইউরোপের ইতিহাসে একদিকে ধ্রুপদী অতীত ও হেলেনীয় সভ্যতা, অন্যদিকে শেষ মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ — এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে এর ক্রম-উন্মেষ ঘটে। এর ফলে 'অতীত' তার পুরানা মাহাত্ম্য হারায়। বর্গ হিসাবে উপন্যাসের উপাদানগুলো এসময়েই জোরালোভাবে আবির্ভূত হয়। যদিও কিছু উপাদান আগে থেকেই ছিল। তাছাড়া উপাদানগুলোর উৎস অবশ্যই লোকসাহিত্যে তালাশ করতে হবে। ইতিমধ্যে আগের সাহিত্যরূপগুলো শুধু পূর্ণতাই পায়নি, মরেও গেছে। সময়কে সামগ্রিক অর্থে অতীতের তলে উপস্থাপন করাই ওই সাহিত্যরূপগুলোর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু উপন্যাস একেবারে শুরু থেকেই সময়কে সম্পূর্ণ নতুন রূপে উপলব্ধির পথ তৈরি করে। নিরেট অতীত, ঐতিহ্য, বা চূড়ান্ত দূরত্ব উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা প্রায় কখনোই রাখেনি, বা সামান্যই রেখেছে।

উপন্যাস তখনই রূপ পেতে থাকে, যখন মহাকাব্যিক দূরত্ব বিশ্বস্ততা হারিয়েছে। যখন দুনিয়া এবং দুনিয়ার মানুষ পরিচিত হাস্যরসাত্মক ভঙ্গি আত্মসাৎ করে নিয়েছে, যখন সাহিত্যিক-শৈল্পিক কর্মকাণ্ড সমসাময়িক বাস্তবতার স্তরে নেমেছে, যে বাস্তবতা সবকিছুকে অঙ্গীভূত করে নিতে চায়। প্রথম থেকেই উপন্যাস গড়ে উঠেছে পুরানা অতীতের সুদূর মূর্তিতে নয়, দৈনন্দিন বাস্তবতার গ্রহিষ্ণু ইমেজে। এর আত্মায় আছে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর মুক্ত সৃষ্টিশীল কল্পনা। শুরু থেকেই উপন্যাস এমন মাটির দলা যা আগের সাহিত্যরূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা — এ এক ভিন্নরকম বীজতলা, যেখান থেকে সমস্ত ভবিষ্যৎ সাহিত্য জন্ম নেবে। জন্মানোর পরেও এটি অন্য দশ সাহিত্যরূপের একটি হয়ে থাকেনি; আর দশটির সাথে সহাবস্থান ও সামঞ্জস্যবিধানের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি নিয়ে এর জন্ম হয়নি। বরং এর উপস্থিতিতে অন্য সব সাহিত্যরূপ একে অনুকরণ করেছে। শুরু হয়েছে অন্য বর্গগুলোর উপন্যাসিত হওয়ার লম্বা লড়াই — বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার লড়াই। এ লড়াই জটিল, বহুবাঁকসম্পন্ন।

দেখা যাচ্ছে, উদ্ভব-বিকাশের বাস্তবতা আর অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য — দুই দিক থেকেই উপন্যাস পূর্বতন সাহিত্যরূপ থেকে বৈপ্লবিকভাবে আলাদা। মহাকাব্য বা কাহিনিকাব্যে উপন্যাসের পূর্বসূরি খোঁজা, অন্তত বাখতিনের মতানুযায়ী, সঙ্গত নয়। বরং বলা যায়, প্রথম থেকেই উপন্যাসের কিছু উপাদান ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরূপগুলোতে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে আসছিল। এই উপাদানগুলোর বরাতেই বাখতিন উপন্যাসের অতীত খোঁজেন অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে থেকে (Bakhtin, 1994 : 50-82)।

৪. উপন্যাসের অতীত ইতিবৃত্ত

সুদূর অতীতেও উপন্যাসের উপাদান ছিল। কিন্তু পৃথক সাহিত্যরূপ হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার বাস্তবতা ছিল না। কিছু কিছু রচনায় অতীতের তুলনায় ভবিষ্যৎমুখী উপাদান বেশি

ছিল। কিন্তু প্রাচীন সমাজে সমসাময়িকতা ও ভবিষ্যতের বোধ দুর্বল ছিল বলে এই রচনাগুলোর ভবিষ্যৎমুখিতা বিকশিত হয়নি। রেনেসাঁর কালে এ বস্তু প্রথম দেখা দেয়। ওই সময় থেকে বর্তমান অতীতের ধারাবাহিকতা হিসাবেই কেবল নয়, নতুন কিছুর সূচনা হিসাবেও অনুভূত হতে থাকে। ওই কালেই বর্তমান স্বচ্ছরূপে মানুষের চেতনায় প্রতিভাত হয়, আর অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতের সঙ্গে সে বেশি নৈকট্য ও আত্মীয়তা বোধ করতে থাকে।

কিন্তু বহুবাস্তবসমন্বিত মানবজীবনের (heteroglossia) যে ধরনের উপস্থাপনার জন্য বাখতিনের কাছে উপন্যাসের এত কদর, তার বিচিত্র প্রকাশ তিনি পুরানা দুনিয়ায় বিস্তর দেখেছেন। মৌখিক সংস্কৃতিতে অন্যের কথা উদ্ধৃতি-আকারে উপস্থাপনের নমুনা পাওয়া যায়। হাজার বছর আগে থেকেই — বিশেষত লোকভাষায় — অন্যের কথা, উচ্চারণ ও ভাষা সুবিধাজনক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনের রেওয়াজ ছিল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষত উপন্যাস শুরুর আগের ইতিহাসেও উপন্যাসের চর্চা হয়েছে। বাখতিনের মতে, পুরানা জমানায় চর্চিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হাসি আর বহুভাষাসমন্বয় (polyglossia)।

প্যারডি অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। গ্রিকদের কমিক অডিসিউস কিংবা কমিক হারকিউলিস প্রমাণ করে, জাতীয় পুরাণের হাস্যরসাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক উপস্থাপনা সেখানে নিষিদ্ধ বা শাস্তিযোগ্য ছিল না। প্রত্যক্ষ (direct) ডিসকোর্স, যেমন, মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, গীতিকবিতা বা দার্শনিক রচনামাত্রেরই প্যারডি রচিত হত। এই আবশ্যিক প্যারডিকরণ প্রমাণ করে, প্রত্যক্ষ ডিসকোর্সগুলো একপক্ষীয়, বদ্ধ, বিষয়কে নিঃশেষে প্রকাশে অসমর্থ। প্যারডিতে সাধারণত মূলের অপ্রকাশিত দিকগুলো সামনে আনা হত। প্রাচীন এই প্যারডিগুলো কিন্তু খারিজিপন্থি নয়। এগুলো, ধরা যাক, হারকিউলিস বা ট্রোজান যুদ্ধ বা তার বীরদের নয়, প্যারডি করত খোদ মহাকাব্যিক বা ট্র্যাজিক বীরত্বপনাকে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরূপের সংকীর্ণ সীমানায় যেসব বিপরীত ভাব ধরা পড়ত না, সেগুলোই রূপায়িত হত প্যারডিতে। রোমান ইতিহাসেও এ বস্তু মশহুর। রোমান শিল্পের ইতিহাসে প্যারডি হয় নাই, এমন 'গুরুগম্ভীর' (serious) শিল্পকর্মের অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। এমন কোনো গুরুতর শিল্পকর্ম ছিল না যার 'হাস্যরসাত্মক জমজ' (comic double) রচিত হয়নি। দেখা যাচ্ছে, আমাদের জানা ইতিহাস প্যারডি বা কমিক রচনার বৈচিত্র্য বা সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল।

প্রশ্ন হল, এই বিচিত্র হাস্যরসাত্মক রচনার ঐক্যসূত্র কোথায়, আর কিভাবেই বা তা উপন্যাসের সাথে যুক্ত?

পুরাকালে প্যারডি-কমেডি কিছু কিছু সাহিত্যরূপ তৈরি করেছে বটে, যেমন স্যাটায়ার, কমেডি, কাহিনিহীন সংলাপ ইত্যাদি; কিন্তু এগুলো নির্দিষ্ট কোনো সাহিত্যরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। কবিতার প্যারডি নিশ্চয়ই কবিতা নয়। এগুলোর মূল ভূমিকা ছিল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরূপ এবং তার ভাষা, শৈলী ও স্বর-সুরকে হাস্যরসাত্মক ও সমালোচনামূলকভাবে হাজির করে মূলে অনুপস্থিত ভাব সম্পর্কে ভোক্তাকে সচকিত করা। দ্বিতীয়ত, উপাদানগুলো একসুতায় গাঁথা সুসম্পন্নরূপে ছিল না বটে, কিন্তু প্যারডিকৃত সংলাপ, প্রাত্যহিক জীবনচিত্র,

হাস্যরস ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এগুলোকে একটা বিশেষ 'ধরন' দিয়েছে। বাখতিনের মতে, এর সামগ্রিক রূপটা এক বৃহৎ উপন্যাসের মতো — বিচিত্র রূপকল্প ও শৈলীর সমন্বয়ে, নিষ্করুণ সমালোচনায়, মার্জিত বিদ্রূপে এটা বহুভাষাসমন্বয়ের এক পূর্ণরূপ প্রকাশ করে — এবং এভাবে যুগের সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর বিচিত্র স্বরের উপস্থাপক হয়ে ওঠে।

সেকালটা উপন্যাস লেখার জন্য উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল। এই প্যারডিকৃত বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলো উপন্যাসের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। যে ভাষা বিষয় জালে আটকা-পড়ার মতো বদ্ধ ছিল, সে ভাষার নির্দিষ্টতা থেকে এগুলো বিষয়কে মুক্তি দিয়েছে; ভাষার উপর মিথের যে আধিপত্য ছিল, তা ধ্বংস করেছে; প্রত্যক্ষ বাচনের স্থিরনির্দিষ্ট বা একমাত্রিক পরাক্রম থেকে চৈতন্যকে মুক্তি দিয়েছে; ঘরানা-নির্দিষ্ট ভাষা আর ডিসকোর্সের পুরু দেয়াল ভেঙে দিয়েছে।

মধ্যযুগের প্যারডি, হাস্যরস আর কার্নিভালের বাধভাঙা বৈচিত্র্য সংখ্যায় যেমন প্রচুর, ধরনেও তেমনি বিচিত্র। আর লক্ষণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এগুলোর সামাজিক অনুমোদনও ছিল। মধ্যযুগের ক্ষয়ের কালে এ ধরনের রচনা রীতি-রুচির বিদ্যমান দেয়াল কার্যত ভেঙে ফেলে। রেনেসাঁর কালে পুরানা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ভাষা আর কথ্যভাষার দ্বিভাষিক অবস্থাও ধ্বংসের শেষধাপে পৌঁছায়। এই ধারা সম্পন্ন হয় মহান রেনেসাঁ-লেখক রেবেলিয়াস ও কার্ভেন্তেসের রচনায়। মধ্যযুগ বা তারও আগে থেকে উপন্যাসের যেসব উপাদানের বিক্ষিপ্ত চর্চা চলছিল, এই দুই লেখকের রচনায় সেগুলো চূড়ান্ত মাত্রায় একত্রে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন ভাষিক-সাহিত্যিক চেতনার জন্ম হয়। রেনেসাঁর নতুন জমানায় নতুন জেগে-ওঠা জনচৈতন্য আর দৃষ্টিভঙ্গির বাহন হয়ে ওঠে মিশ্রভাষার অসংখ্য রচনা। লাতিনের সাথে কথ্যভাষার মিশেলে রচিত এই লেখাগুলো নতুন বাস্তবতা আর যুগচাহিদারই ফসল — সচেতন প্রয়াস। এগুলো প্রমাণ করে ভাষা আর দৃষ্টিভঙ্গি কী ভীষণ অচ্ছেদ্য। আরো প্রমাণ করে, পুরানা আর নতুন দুনিয়া নিজ নিজ ভাষাতেই কেবল চিত্রিত হতে পারে। এ এমন এক ক্ষণ, যখন পুরানা ভাষা আর নতুন ভাষা পরস্পরের মুখোমুখি। কিন্তু পরের ধাপে উত্তরণের কাজটা বিমূর্ত যুক্তির সংলাপে সম্ভব ছিল না, নাটকীয় সংলাপেও নয় — সম্ভব ছিল কেবল জটিল সংলাপধর্মী সংকরায়ণে। রেনেসাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলো এ রকমের সংকর — যদিও এগুলো একভাষী।

ভাষিক পরিবর্তনের এইকালে জাতীয় ভাষার উপভাষাগুলোও নতুন গতি পায়। অন্ধকারে তাদের বোবা সহাবস্থানের যুগ শেষ হয়। প্রত্যেক উপভাষার স্বাতন্ত্র্য নতুনভাবে উপলব্ধ হতে থাকে, আর জাতীয় ভাষার কেন্দ্রীয় ময়দানে তারা শরিক হয়। উপভাষার এতদিনকার প্যারডিকৃত রূপ বা ব্যবহার নান্দনিক তাৎপর্যে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মে স্থান করে নেয়। ভাষাগুলো পরস্পরকে প্রাণবন্ত করে তুলতে থাকে। ইউরোপীয় ভাষার ইতিহাসের এই বিশেষ যুগেই উপন্যাসের উদ্ভব। হাস্যরস আর বহুবাস্তবসমন্বিত-পরিস্থিতি (heteroglossia) আধুনিক উপন্যাসের পথ সুগম করে। বলা দরকার, উপন্যাসের উদ্ভব কেবল সাহিত্যিক শৈলীর ব্যাপার নয়, সাহিত্যিক প্রবণতার লড়াই বা বিমূর্ত জীবনদৃষ্টির মামলা নয়। এটা শতাব্দী-পরম্পরায় চলা সংস্কৃতি ও ভাষার জটিল লড়াইয়ের স্মারক।

প্রধান ইউরোপীয় ভাষা এবং ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংকট ও পরিবর্তনের প্রধান ধাপগুলোর সাথে এর যোগ। সংকীর্ণ সাহিত্যকেন্দ্রিক ইতিহাসের আওতায় এটা ধরা পড়বে না।

৫. উপন্যাস কী করে?

বাখতিন *Problems of Dostoevsky's Art* প্রকাশ করেন ১৯২৯ সালে। এই সংস্করণে দস্তয়েভস্কিকে তিনি উপন্যাসের ধারায় অদ্বিতীয় লেখক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু নতুন লেখা যুক্ত হয়। এখানে দস্তয়েভস্কিকে উপন্যাসের ধারাপ্রবাহের একজন হিসাবে দেখা হয়েছে, যাঁর মধ্যে মাধ্যমটির শিল্পরীতি চরম সার্থকতা লাভ করেছিল। চৌত্রিশ বছরের তৎপরতা উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন আনে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাস পূর্বসূরিহীন নয়। বরং উপন্যাসে এই উপাদানগুলো বরাবরই ছিল। উপন্যাস কেবল আমাদের কালের সাহিত্যিক প্রগতির প্রধান অনুঘটক নয়, পুরানা জমানায়ও সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শক্তিই ছিল, যেকালে উপন্যাস আদৌ ছিল না বলেই বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন।

প্লেটোর আথিনা বা মধ্যযুগে উপন্যাস ছিল না যাঁরা বলেন, সেই পণ্ডিতদের সংজ্ঞা-অনুযায়ী কথাটা ঠিকই আছে। বাখতিন কিন্তু সার্ভেন্তেস বা রিচার্ডসন থেকে যে উপন্যাসের শুরু, উপন্যাস বলতে তা বোঝাননি। এই লেখকদের লেখা বা সেগুলো থেকে উদ্ভূত উনিশ শতকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস নিশ্চয়ই 'উপন্যাস' নামের সাহিত্যরূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পণ্ডিতদের বড় অংশই নির্দিষ্ট কায়দা-কানুনের এই সাহিত্যরূপই বিশ্লেষণ করেন। এ কারণেই বাখতিন মনে করেন, উপন্যাসের ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য আদৌ ওই ধরনের সাহিত্যতত্ত্বের নেই। তাঁর মতে, 'উপন্যাস' বরং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যতন্ত্রের নির্দিষ্ট বিধিবিধানের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে, ওই বিধিবিধানের কৃত্রিম বাধানিষেধ শনাক্ত করে। যে কোনো সাহিত্যতন্ত্রই কায়দা-কানুনের সমষ্টি; আর 'উপন্যাসায়ন' আবশ্যিকভাবে কানুন-বিরোধী। এখানে স্বগতোক্তির কোনো জায়গা নাই। বরং যে সাহিত্যরূপগুলো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের অনুগামী আর যেগুলো এর অনুমোদিত সীমার বাইরের—এ দুইয়ের মধ্যে সংলাপের উপরই জোর দেয় উপন্যাস। যাকে প্রথাগত অর্থে উপন্যাস বলা হয়, তা আসলে এই ধারণারই জটিল পরিশোধিত রূপায়ণ। (Holquist, 1994 : xxxi)

উপন্যাসকে এভাবে দেখলে পণ্ডিতেরা যেভাবে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখেন, তারচেয়ে অনেক আগে থেকেই উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। বাখতিন অন্তত প্রাচীন গ্রিক পর্যন্ত যান। তিনি নাটকীয় সংলাপের নিপুণ প্রবর্তক হিসাবে প্রথম ঔপন্যাসিক রূপে সক্রেটিসকেই প্রায় সাব্যস্ত করে ফেলেন, কারণ উপন্যাস কম-বেশি একাজই করে। স্বীকারোক্তি, ইউটোপিয়া, পত্র বা মেনিপিয়ান স্যাটায়ার প্রভৃতি অপ্রতিষ্ঠিত রূপের ব্যাপারে বাখতিনের প্রবল আগ্রহের কারণও একই — সংলাপকে আত্মসাৎ করে নেয়া। হাল-আমলের নাটক বা লম্বা কবিতায় তিনি ছদ্মবেশী উপন্যাসকেই দেখেন। উপন্যাসের সাহিত্যরূপ-বিরোধী শক্তির প্রতাপে এই পুরানা প্রতিষ্ঠিত রূপগুলো নিজেদের বিশুদ্ধতা হারিয়েছে এবং 'উপন্যাসিত' হয়েছে।

শৈলীর দিক থেকে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় উপন্যাসের দুই ধারা শনাক্ত করেছেন বাখতিন (Bakhtin, 1994 : 367-415)। একভাগে পড়বে সেই উপন্যাস, বহুবাস্তবসমন্বিত-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জন্ম নিলেও এবং সংলাপায়িত হলেও বহুস্বর বা বিচিত্র বাস্তবকে যেগুলো গুরুত্ব দেয় না। দ্বিতীয় ধারার উপন্যাস বহুবাস্তবের সমন্বয়কে গুরুত্ব দিয়েছে; চরিত্রের ভিন্নতা সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে অন্যের ডিসকোর্স অন্যের ভাষায় উপস্থাপন করতে চেয়েছে। স্পষ্টতই বাখতিনের পক্ষপাত দ্বিতীয় ধারার প্রতি। এ ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসাবেই দস্তয়েভস্কির প্রতি তাঁর উদার আনুকূল্য। *Problems of Dostoevsky's Art* বইয়ের পরিবর্ধিত সংস্করণেও তাঁর যে দাবিটি অক্ষুণ্ন ছিল তা হল : দস্তয়েভস্কি বহুস্বর উপন্যাসের আবিষ্কর্তা। পূর্বসূরিদের চেয়ে তাঁর উপন্যাসের সংগঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাতে রচয়িতা শেষ কথা বলার সুযোগ নেয় না, চরিত্রগুলো পূর্ণ ও সমান সুযোগসহ নিজ নিজ কথা বলতে পারে : 'A plurality of independent and unmerged voices and consciousnesses, a genuine polyphony of fully valid voices is in fact the chief characteristic of Dostoevsky's novels.' (Bakhtin, 1999 : 6) এই উপন্যাসগুলোতে কোনো বাড়তি শিল্প-সচেতনতা চরিত্রগুলোর গড়ন আর পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে না। বরং চরিত্রগুলোর স্বর আর বর্ণনাকারীর স্বর এক অসমাপ্ত সংলাপে নিরত থাকে। তার মানে এই নয় যে, বিভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ডিসকোর্সের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থতাই এর লক্ষণ। তা নয়। বরং বহুস্বর উপন্যাসের সাফল্যের প্রাথমিক শর্তই হল বিভিন্ন ডিসকোর্সের পারস্পরিকতা, যেখানে নিজ এবং অপর গভীরভাবে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে[২]।

বহুস্বরতার এই নান্দনিকতা উপন্যাসের গড়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। একস্বর উপন্যাসে লেখক চরিত্রের চৈতন্য নির্ধারণ করে দেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোনটি জয়ী হবে তাও নির্ধারণ করেন। চূড়ান্ত কথাটি এভাবে রচয়িতার কর্তৃত্বেই নির্ধারিত হয়। বাখতিনের মতে, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে এ ধরনের কোনো চূড়ান্ত কথার জোগান থাকে না। রচয়িতা বা উপন্যাস বিদ্যমান দ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা নির্দেশের দায়িত্ব নেয় না। অতীত নয়, ভবিষ্যতের জন্যই তা উন্মুক্ত থাকে। এভাবে দস্তয়েভস্কি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকেও নাকচ করে দেন। কারণ এ পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয় কেবল চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে। এটা একস্বর উপন্যাসেরই বৈশিষ্ট্য। ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বাখতিন ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কি আর সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী দস্তয়েভস্কির মধ্যে ফারাক টানেন (Dentith, 1996 : 45)। তিনি দেখান, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী হিসাবে দস্তয়েভস্কি বহু বিষয়ে মত দিয়েছেন, পক্ষপাত জানিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে তাঁর সেকথাগুলো সংলাপায়িত হয়ে উপস্থিত হয়েছে। অনেক স্বরের একটি হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

অন্যত্র উপন্যাসের আদর্শ হিসাবে তিনি নিয়েছেন পুশকিনের *ইউজিন ওনেগিনকে* (Bakhtin, 1994 : 48-49)। বলেছেন, উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষা ও শৈলীর ধরন একসাথে বিরাজ করে। এ কারণেই একই তলে বা একই রেখায় উপন্যাসের ভাষাকে সংকীর্ণ করা যায় না। বরং এ এমন এক ময়দান যেখানে পরস্পরছেদী তল বা রেখা একসাথে অবস্থান করে — যাকে বলা যায় : *heterogenous* linguistic and stylistic forms।

ওনেগিনে এমন শব্দ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যা সরাসরি লেখকের শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুশকিনের গীতিকবিতা কিন্তু তাঁর নিজেরই শব্দ, নিজেরই উচ্চারণ। তার মানে এই নয় যে, উপন্যাসে বাচিক-আদর্শিক কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই; কোনো কেন্দ্র নাই। আছে; কিন্তু কোনো একটি ভাষিক তলে লেখককে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে তল বা রেখাগুলোর সঙ্গমস্থলে। এই কেন্দ্র থেকে তলগুলো বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে।

বেলিনস্কি পুশকিনের উপন্যাসকে বলেছেন 'রুশজীবনের কোষগ্রন্থ'। প্রাত্যহিক জীবনের নিষ্প্রাণ তালিকার কোষগ্রন্থ নয়। তাঁর উপন্যাসে রুশজীবন সমস্ত স্বরে কথা বলে, যুগের সমস্ত ভাষা ও শৈলীতে কথা বলে। সাহিত্যিক ভাষা উপন্যাসে একরৈখিক বা সম্পন্ন বা বিতর্কমুক্ত ভাষা হিসাবে উপস্থাপিত হয় না। বরং উপন্যাস পরস্পরবিরোধী স্বরের জিয়ল মিশ্রণ। স্বরগুলো ক্রমে নিজেদেরকেই গড়ে তোলে এবং পরস্পরকে নতুনত্ব দেয়। এর মধ্যেই লেখকের ভাষা নিরন্তর লড়াই করে। এ লড়াই যুগনির্দিষ্ট চলের মুমূর্ষু ভাষার 'সাহিত্যিকতা' থেকে মুক্তির লড়াই। লোকমুখে চালু ভাষা থেকে জীবনীশক্তি শুষে নিয়ে নিজেকে নতুনত্ব দেয়ার লড়াই। লোকভাষা আর প্রতিষ্ঠিত ভাষারূপের ইতর দ্বন্দ্ব এ নয়। পুশকিনের উপন্যাস যুগের সাহিত্যিক ভাষার নানা স্তরকে — দৈনন্দিন ভাষা, বিভিন্ন সাহিত্যরূপের ভাষা, চালু ফ্যাশনের ভাষা ইত্যাদিকে — নতুন জীবন দিয়েছে। পরস্পর একাকার হয়ে গিয়ে একটি ভাষা অন্যটিকে সজীব করেছে। ভাষার বিভিন্ন ধরন সংশ্লিষ্ট জীবনদৃষ্টি থেকে আলাদা কিছু নয়। যে মানুষটি ভাবে, কথা বলে, কাজ করে, সে সামাজিক-ঐতিহাসিকভাবে মূর্ত। শৈলীর দিক থেকে বলা যায়, উপন্যাসে আমরা সংলাপমুখর গ্রন্থনায় যুগের ভাষাবৈচিত্র্যের জটিল কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জটিলতার বৈচিত্র্যও পাই, যেখানে ভিন্ন 'ভাষা' বা 'স্বর'গুলো উপন্যাসের শৈল্পিক-আদর্শিক কেন্দ্র থেকে নিজ নিজ দূরত্বও রক্ষা করে। *ওনেগিনের* মতো আদর্শ সব উপন্যাসের ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

উপন্যাসের ভাষা শুধু দেখায় না, নিজেকে দেখার জন্যও হাজির করে।

৬. প্রচলিত উপন্যাসপাঠের সীমাবদ্ধতা

উপন্যাসের ধরন-ধারণ সম্পর্কে বিস্তর কাজ হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যরূপ হিসাবে উপন্যাসকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কাজটা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য সাহিত্যরূপের মতো করে, তাদের সাথে তুলনা করে, উপন্যাসকে দেখা হয়েছে। কিন্তু এ কাজগুলো সাহিত্যরূপ হিসাবে উপন্যাসের কোনো সামগ্রিক পরিচয় দেয় না। পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে কিছু বৈশিষ্ট্যযোগে; কিন্তু পরক্ষণেই আরো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো আগেরগুলোকে বাতিল করে দেয়। যেমন, যদি বলা হয় উপন্যাস বহুস্তর, তাহলে বলা যাবে : একক স্তরের মহৎ উপন্যাসও আছে। যদি বলি জটিল মাধ্যম, তাহলে বলতে হয় : জনপ্রিয় সরল উপন্যাসও অনেক। উপন্যাসকে ভালোবাসার আখ্যান বলা হয়েছে; কিন্তু ইউরোপের ভালো উপন্যাসের অনেকগুলোতেই ভালোবাসার নামগন্ধ নাই। উপন্যাস গদ্যে লেখা হয় বললে চলছে না, কারণ পদ্যেও অনেক লেখা হয়েছে।

আরো কিছু আনুশাসনিক সংজ্ঞা দিয়েছেন খোদ ঔপন্যাসিকেরা। কোনো একটি উপন্যাস ধরেও আদর্শ ঠিক করার চেষ্টা হয়েছে। এগুলো কাজের। কারণ এগুলো উপন্যাসের হয়ে ওঠার এক-একটি পর্বের চিহ্নায়ক।

ফিল্ডিং থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত অনেকেই নতুন সাহিত্যরূপ হিসাবে উপন্যাসকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের আলোচনার সারসংক্ষেপ করেছেন বাখতিন (Bakhtin, 1994 : 10) : ১. কল্পসাহিত্যের অন্যসব শাখায় 'কাব্য' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে উপন্যাস কাব্যিক হবে না; ২. উপন্যাসের নায়ক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো হবে না। ভালোর সাথে তার মধ্যে মন্দও থাকবে; নীচতার সাথে মাহাত্ম্য; হাস্যের সাথে গাম্ভীর্য; ৩. নায়ক বিকশিত অবস্থায় আবির্ভূত হবে না। হবে বিকাশমান। জীবনের পথপরিক্রমায় সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হবে; ৪. উপন্যাস সমকালের জিনিস, যে অর্থে মহাকাব্য পুরাকালের।

এ গুণগুলো নিঃসন্দেহে উপন্যাসকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। কিন্তু এগুলো এটা বোঝায় না যে, উপন্যাস নিজেই নিজেকে পরিবর্তন করে চলছে; এবং এ যুগের সাহিত্যরূপ হিসাবে অন্য সাহিত্যরূপগুলোকেও প্রভাবিত করছে।

উপন্যাস দীর্ঘদিন পড়া হয়েছে 'কী বলা হয়েছে' ধরনের জায়গা থেকে। শৈলীর দিকটায় নজর দেয়া হয়নি। ভাষাগত শৈলী বোঝা হয়েছে কাব্যভাষার সাপেক্ষে, অথবা অলঙ্কারবিদ্যার সাপেক্ষে। ভাষার 'প্রকাশক্ষমতা', 'চিত্রকল্প', 'গতি', 'স্বচ্ছতা' ইত্যাদি তালাশ করা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে সাহিত্য-আঙ্গিক হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের গদ্যশৈলীর বিশেষত্বের দিকে মনোযোগ বাড়ে। কিন্তু সাহিত্যরূপগত দিক থেকে আলোচনা মোটেই অগ্রসর হয়নি। মনোযোগ সীমিত ছিল আঙ্গিকগত সমস্যাগুলোর দিকে। উপন্যাস বা গল্পে ডিসকোর্স যে বিশিষ্ট শৈলী অর্জন করে, তাতে মনোযোগ দেয়া হয়নি। ভাষা ও শৈলীর বিবেচনায় মূল্যায়নধর্মী প্রবণতাই রাজত্ব করছিল — কথাসাহিত্যের গদ্যের স্বতন্ত্র তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়নি। এ ব্যর্থতার ফলে একটি জোরালো মত দাঁড়িয়ে যায় : উপন্যাসের ভাষা এর শৈলীর আবশ্যিক উপাদান নয়, এবং এর স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য নাই। এটি দৈনন্দিন ভাষার মতোই, বা বিজ্ঞান-লেখার ভাষার মতো শিল্প-নিরপেক্ষ ভাষা। এই দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসের শৈলীগত বিশ্লেষণকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে, কেবল থিমের বিশ্লেষণেই কাজ শেষ হয়।

১৯২০-এর দশকে উপন্যাস নিয়ে গুরুতর কাজের পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু আলোচনার ধরনটা ছিল ব্যক্তি ঔপন্যাসিক আর বিশেষ উপন্যাসকেন্দ্রিক। সামগ্রিকভাবে খোদ উপন্যাসের শৈলীর তত্ত্বায়ন হয়নি। এ ধরনের কাজের পাঁচটি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন বাখতিন (Bakhtin, 1994 : 42) : ১. লেখকের নিজের কথাগুলো আলগা করে নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা; ২. উপন্যাসকে শৈল্পিক সমগ্রতার নিরিখে না দেখে ঔপন্যাসিকের ভাষার আলাদা বয়ান তৈরি; ৩. নির্দিষ্ট ঔপন্যাসিকের প্রবণতা নির্দেশ — রোমান্টিক বা প্রকৃতিবাদী বা ইম্প্রেশনিজমবাদী ইত্যাদি; ৪. উপন্যাসের ভাষায় লেখকের ব্যক্তিত্ব খোঁজা; ৫. আলঙ্কারিক একক হিসাবে উপন্যাসকে দেখা — উপন্যাসের

কলাকৌশলগুলোকে আলঙ্কারিক কার্যকরতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করা। সবগুলো ক্ষেত্রেই উপন্যাসের বিশিষ্ট বয়ানে শব্দ বা কথার যে বিশেষ তাৎপর্য তৈরি হয়, তার ব্যাখ্যা অধরা থেকে যায়। উপন্যাসের ভাষা ও শৈলী বাদ রেখে তাঁরা ঔপন্যাসিকের ভাষা ও শৈলী ব্যাখ্যা করেন। ফলে ব্যাখ্যাটা হয় আসলে 'কবিতার ভাষা' বা 'সাহিত্যের ভাষা'র আওতায়। উপন্যাস ভাষা-ব্যবহারের যে বিশিষ্ট ধরন তৈরি করে, যে বিশেষ সম্ভাবনা তৈরি করে, তা বাদ পড়ে যায়।

ভাষার 'কাব্যিক ব্যবহার' আর 'ঔপন্যাসিক ব্যবহার' এত আলাদা যে, কাব্যিক ভাষার ধারণা দিয়ে উপন্যাসপাঠ ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপন্যাসে, বিশেষত লেখকের নিজস্ব ডিসকোর্সে, ভাষার কাব্যিক ব্যবহারও হয়; কিন্তু উপন্যাসের জন্য তা নিতান্তই গৌণ। বাখতিনের মতে :

> [A]ll essentially novelistic images share this quality : they are internally dialogized images — of the languages, styles, world views of another (all of which are inseparable from their concrete linguistic and stylistic embodiment). The reigning theories of poetic imagery are completely powerless to analyze these complex internally dialozied images of whole languages. (Bakhtin, 1994 : 47)

আর এ কারণেই উপন্যাসের অঙ্গনে এলেই সাহিত্যতত্ত্বের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়। অন্য সাহিত্যরূপ নিয়ে কারবার ভালোই চলে। ওগুলোর বিকাশ অনেক আগেই রুদ্ধ হয়েছে। ধ্রুপদী যুগে এগুলো সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়ে গেছে। যুগে যুগে কী ধরনের বদল হয়েছে তাও স্পষ্ট। ঘরানা বা প্রবণতার পার্থক্য বা যুগপার্থক্য এগুলোর মূল কাঠামোয় বদল ঘটাতে পারে না। এসব ব্যাপারে যাঁরা লেখেন, তাঁরা অ্যারিস্টটলেরই অনুসরণ করেন। মাঝে মাঝে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু আজতক সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় অ্যারিস্টটলের *কাব্যতত্ত্বই* প্রধান উৎস। যতক্ষণ উপন্যাসের দেখা না মেলে ততক্ষণ এতেই কাজ চলে। উপন্যাসে এলেই তত্ত্ব কানাগলিতে পথ হারায়। উপন্যাসের যুগে সাহিত্যরূপ-সম্পর্কিত তত্ত্বের সম্পূর্ণ নবায়ন আবশ্যিক।

৭. ভাষার স্বভাব ও প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের সংকট

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাখতিন ব্যতিক্রমহীনভাবে একটা কাজ করে গেছেন — খুব স্বতন্ত্র ধরনে ভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ভাষার অস্তিত্বে তিনি দেখেছেন দুই বিপরীত স্বভাবের বিরোধ আর বিরামহীন লড়াই — একদিকে কেন্দ্রাতিগ শক্তি, যা একে বৈচিত্র্যে প্রসারিত করতে চায়; অন্যদিকে এক কেন্দ্রমুখী শক্তি, যা উপাদানগুলোকে সামঞ্জস্যে মিলাতে চায়। এই জরথুস্ত্রীয় দ্বন্দ্ব সংস্কৃতিতেও আছে, প্রকৃতিতেও আছে; মানুষের চৈতন্যেরও এটা সহজাত, আর মানুষের উচ্চারণেও তা বিশেষভাবে কাজ করছে। মানুষের ভাষা হল এই দ্বন্দ্বের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং জটিল আবাস; আর উপন্যাস হল এই ভাষার সর্বোত্তম প্রতিলিপি (Holquist, 1994 : xviii)। ভাষা কেবল এই দ্বন্দ্বের প্রকাশক বা আশ্রয় নয়; বরং সে নিজেই এই দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ নমুনা। কাঠামোবাদী তাত্ত্বিকদের মতো বাখতিন এই

দুই দ্বন্দ্বকে বিপরীত শব্দজোড় (binary opposition) হিসাবে দেখেননি। তাঁর কাছে এই দুই বিপরীত শক্তি ঐতিহাসিকভাবে ভাষার হয়ে ওঠা, অর্থের স্থিতি ও লয়ের সাথে যুক্ত। এটা যান্ত্রিক নয়, বরং মানুষের স্বভাবের মতোই অনির্দিষ্ট।

ভাষার স্বভাব আর উপন্যাসের শৈলী সম্বন্ধে এরূপ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তই বাখতিনকে নতুন নন্দনতত্ত্বে উপনীত করেছে। বিপরীতে, প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের সমস্যা, বাখতিনের দিক থেকে, ভাষা-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিরই সমস্যা। সে এক ঘোরতর বিচ্যুতি বৈকি। ভাষা-বর্ণনার ক্ষেত্রে এ বিচ্যুতির ফলেই সমালোচকেরা উপন্যাসের ভাষাকে দেখেন সোস্যুরীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে — ভাষার সাধারণ কেতার মধ্যে ব্যক্তির ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে। এ দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে উপন্যাসের ভাষায় ঐক্যের খোঁজটাকেই বড় করে তোলে, অন্যদিকে সে ভাষায় ব্যক্তি কিভাবে ধরা পড়ে তার অনুসন্ধান করে। কাব্যিক ভাষা বিশ্লেষণে এ দুই দিক আবশ্যিক, যদিও কাব্যভাষার ক্ষেত্রেও এগুলো যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিগত ভাষা-বর্ণনা বা কোনো কবির ভাষা-বর্ণনার লক্ষ্য যদি কেবল এই হয় যে, ভাষার প্রকাশক্ষমতা বা ভাষিক উপাদানই শুধু বিশ্লেষিত হবে, তবুও কাব্যের শৈলী-ব্যাখ্যার জন্য তা যথেষ্ট নয়, যদি না পুরো ভাষা-ব্যবস্থা (system of language) বা উচ্চারণ-ব্যবস্থার (system of speech) সাথে তাকে সম্পর্কিত করা হয়। অর্থাৎ কাব্যভাষার পাঠও বিভিন্ন ভাষিক ঐক্যের সাপেক্ষে পাঠ্য, খোদ কাব্যটির ভাষা-ব্যবস্থার সাপেক্ষে নয়। তবুও অধিকাংশ কাব্যরূপের ক্ষেত্রে ভাষার সাধারণ কেতার মধ্যে ব্যক্তি-কবির বিশেষ ভাষা যেভাবে আলাদা হয়ে ওঠে, তার পাঠ কাব্যশৈলীর পাঠের জন্য আবশ্যিক। উপন্যাসে কিন্তু এটা কেবল অদরকারিই নয়, ক্ষতিকরও বটে। ভাষার নানা স্তর, সামাজিক বহুস্বর, ব্যক্তিগত স্বরের বৈচিত্র্য উপন্যাসের ভাষার আবশ্যিক শর্ত।

ফলে উপন্যাসের ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে (যদি এরকম ভাষা সত্যি সত্যি আলাদা করে দেখা সম্ভব হয়) দুরকম বিপদ ঘটে : একদিকে এই ধারণার সাথে খাপ খায় এমন অংশবিশেষ বর্ণিত হয় ঔপন্যাসিকের ভাষা হিসাবে; অন্যদিকে, উপন্যাসের ভাষার প্রধান যে দিক — বহুস্বরতা — তা বাদ পড়ে। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, পুরো উপন্যাসের শৈলীর বিবেচনায়ও ঘটে একই ধরনের গলদ। অন্তর্গত উপাদানগুলোর দু-একটির শৈলীকে ব্যাখ্যা করা হয় উপন্যাসের শৈলী হিসাবে। যেমন প্রায়শই বলা হয়, উপন্যাস মহাকাব্যিক। সেক্ষেত্রে, মহাকাব্যের সাথে উপন্যাসের মিল যেখানে, সেটুকুই কেবল ব্যাখ্যা করা হয়; যেমন, রচয়িতার প্রত্যক্ষ বয়ান। উপন্যাস ও মহাকাব্যের গভীর ফারাক অগ্রাহ্য করা হয়। এরকম বিশ্লেষণ সমগ্রের ব্যাখ্যা নয়। এমনকি অংশেরও ব্যাখ্যা নয়। কারণ অংশকে যখন সমগ্র থেকে এভাবে আলাদা করা হয়, তখন তা আর সেরকম থাকে না, সমগ্রের অংশ হয়ে যেভাবে থাকে।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রচলিত শৈলীবিদ্যা এবং এর পরিভাষা, যেমন, 'কাব্যিক ভাষা', 'ভাষার ব্যক্তিত্ব', 'ইমেজ', 'প্রতীক', 'মহাকাব্যিক শৈলী' ইত্যাদি উপন্যাসের শৈলী ব্যাখ্যা করতে অপারগ, ব্যক্তি সমালোচক যতই মুনশিয়ানা দেখাক না কেন। এগুলো একক ভাষা ও একক শৈলীর সাহিত্যরূপের জন্য উদ্ভূত ও নিয়োজিত

পরিভাষা। সীমিত অর্থে বলা যায়, কাব্য-ভাষার ব্যাখ্যার জন্য এগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ। এই বর্গগুলো উপন্যাসের ডিসকোর্স ব্যাখ্যার জন্য খুবই অনুপযোগী। প্রচলিত কাব্যতত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতাই এর কারণ। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কাব্যতত্ত্বের আলোচনা 'আনুষ্ঠানিক' রূপ তৈরির দিকেই মনোযোগী থেকেছে। ভাষার জীবন-সম্পর্কিত বিশেষ ঐতিহাসিক প্রবণতা এর সাথে যুক্ত। ভাষা-সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক এতে উপেক্ষিত থেকেছে।

ভাষার দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, শৈলীবিদ্যা এ যাবৎ ব্যক্তির 'নিজস্ব' একক ভাষার সাথে তার সরল সম্পর্ক সাব্যস্ত করে ব্যক্তির ভাষা বিশ্লেষণ করেছে। ব্যক্তির একরৈখিক উচ্চারণে ভাষার সৌন্দর্য খুঁজেছে। বিদ্যার এ শাখাগুলো ভাষার দুটি প্রাপ্তি-সম্পর্কে কেবল ওয়াকিবহাল। এর মধ্যেই তাদের ভাষাগত ও শৈলীগত তাবৎ ধারণাকে তারা গুঁজে দেয়। একটি হল একরৈখিক ভাষাকাঠামো (unitary language), অন্যটি হল, এই ভাষা-ব্যবহারকারী ব্যক্তি। যুগে যুগে কাব্যতত্ত্ব বা মতাদর্শিক শৈলীর নানা বিচিত্র রূপ আবির্ভূত হয়েছে। যুগ-সত্যের অধীনে ভাষাদর্শন, ভাষাতত্ত্ব বা শৈলীবিজ্ঞানের নতুন নতুন রূপও আমরা পেয়েছি। 'ভাষা-কাঠামো', 'একরৈখিক উচ্চারণ', 'কথক ব্যক্তি' ইত্যাদি ধারণার নানা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ তাতে পাওয়া গেছে। কিন্তু এই দুই প্রান্তসীমা সবসময়েই একই থেকেছে। শৈলীবিদ্যার মূল বর্গগুলো ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশেষ গতিবিধি আর সে ইতিহাসের পাটাতনে ভাষাদর্শিক ডিসকোর্সগুলো যা হাসিল করতে চেয়েছে, তার নিরিখেই সাব্যস্ত হয়েছে। এ কথা মনে রাখলে বর্গগুলোর জোরের উৎস আর সীমাবদ্ধতা সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। বিশেষ সামাজিক বর্গ বা শ্রেণির ভাষিক-মতাদর্শিক আওতার মধ্যেই ইতিহাসের নির্ধারক 'মূল শক্তিগুলো' কাজ করে। ভাষাতাত্ত্বিক বা শৈলী-সম্বন্ধীয় বর্গগুলো এর অধীনেই জন্মে, বেড়ে ওঠে, রূপ পায়। ভাষার নতুন প্রাণ-সৃষ্টিকারী এই 'মূলশক্তিগুলো'র তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয় বর্গগুলোতে : 'These forces are the forces that serve to unity and centralize the verbal-ideological world.' (Bakhtin, 1994 : 270)

একরৈখিক ভাষা (unitary language) হল বৈচিত্র্যকে একীভূত আর কেন্দ্রীভূত করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল — ভাষার কেন্দ্রমুখিতার প্রকাশ। একরৈখিক ভাষা কোনো প্রাপ্ত বা বাস্তব বা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, বরং সবসময়েই আরোপিত, কৃত্রিমভাবে নির্মিত—জন্মমুহূর্তেই এটি বহুভাষিক বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেই বহাল হয়। অবশ্য, এটা বৈচিত্র্যের গোলমাল কমিয়ে পারস্পরিক বোধগম্যতা নিশ্চিত করে; ভাষার প্রাত্যহিক ব্যবহারকে সম্ভবপর করে তোলে। প্রাত্যহিক কথ্যভাষা আর সাহিত্যিক ভাষার বাস্তবসম্মত আপাত-ঐক্য সাধন করেই 'শুদ্ধ ভাষা' প্রস্তাবিত হয়। এর কায়দা-কানুনের মধ্য দিয়ে ভাষা নতুন জীবন পায়, বাচনিক-মতাদর্শিক চিন্তা একীভূত ও কেন্দ্রীভূত হয়, বিচিত্র গতি-প্রকৃতিসম্পন্ন জাতীয় ভাষার মধ্যেই স্বীকৃত সাহিত্যিক ভাষার একটি অনমনীয় স্থায়ী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষা বলতে এখানে বিমূর্ত ব্যাকরণিক বর্গের সমষ্টি বোঝানো হচ্ছে না; বরং ভাষা যে অর্থে মতাদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয়, যে অর্থে বিশ্বদৃষ্টি হিসাবে বর্ণিত হয়, তাকেই বোঝানো হচ্ছে। এমনকি ভাবাদর্শিক জীবন বিচিত্র দিকের পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য

দিয়ে ভাষার মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ফলে এরকম কেন্দ্রীভূত একরৈখিক ভাষা সমাজকাঠামোয় বিদ্যমান অধিপতি শক্তিগুলোর বাচনিক-মতাদর্শিক অবস্থানেরই বাহন হয়ে ওঠে। স্পষ্টতই সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতাসম্পর্কের চলনের সাথে ভাষার এই কেন্দ্রায়ন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, অগাস্টিনের কাব্যতত্ত্ব, মধ্যযুগের গির্জার কাব্যতত্ত্ব — 'সত্যের একমাত্র ভাষা' যার অবলম্বন, কার্থেজীয় নব্য ধ্রুপদীবাদ, লাইবনিজের বিমূর্ত বিশ্বজনীন ব্যাকরণ কিংবা হামবোল্টের মূর্ততার প্রতি জোরারোপ — এদের মধ্যে সূক্ষ্ম যত ভিন্নতাই থাকুক না কেন, আদতে সামাজিক-ভাষিক এবং মতাদর্শিক জীবনের কেন্দ্রমুখী অভীপ্সাই তাতে প্রকাশ পেয়েছে। ইউরোপীয় ভাষাগুলোর কেন্দ্রমুখী একরৈখিক রূপ প্রণয়নের প্রকল্পেই সবাই সাহায্য করেছে। উপভাষাগুলোর মধ্যে একটির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে অন্যগুলোকে হটিয়ে দেয়া বা অন্যগুলোকে একটির দাস বানানো; 'খাঁটি শব্দ' যোগে এগুলোকে আলোকিত করার প্রক্রিয়া; নিম্নশ্রেণির মানুষ ও 'বর্বর'দের একরৈখিক সংস্কৃতি ও সত্যে শামিল করানো; ভাষাদর্শিক কাঠামোর অধীনে নিয়ম-কানুন তৈরি করা; মৃতভাষা — যে ভাষাগুলো স্বভাবতই একরৈখিক — পড়ানো-শেখানোর ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলো পাঠের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়া হয়েছে, বিশেষত ভাষিক বহুত্বের বদলে একক প্রত্নভাষার সন্ধান — এই সবকিছুই 'একক ভাষা'-বর্গের শক্তি ও সার (content) নির্ধারণ করেছে। নির্মাণ করেছে অধিকাংশ নন্দনতত্ত্বের রীতি-নির্ধারক বয়ান। কেন্দ্রমুখী বাচনিক-ভাবাদর্শিক জীবনের সাথে এই ভাষিক-নন্দনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

মুশকিল হল, 'একক ভাষা'য় মূর্ত এই কেন্দ্রমুখী ভাষিক বাস্তবতা, ধরা যাক, প্রমিত ভাষা, বহুভাষিক সমাজ বাস্তবতার মধ্যেই কাজ করে। যে কোনো বিশেষ মুহূর্তে ভাষা কেবল উপভাষায় (প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞা মোতাবেক) বিভক্ত থাকে না, বরং — আমাদের জন্য অধিক তাৎপর্যপূর্ণ — বিভক্ত থাকে নানা সামাজিক-মতাদর্শিক বর্গেও। বিভিন্ন সামাজিক বর্গের ভাষা, পেশাগত বা শ্রেণিগত ভাষা, প্রজন্মের ভাষা ইত্যাদি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্যের ভাষা আসলে বহুভাষিক বিদ্যমানতার একটি মাত্র; সে নিজেও বিভিন্ন রূপে বিভক্ত — উপন্যাস-নাটক-কবিতার ভাষা, প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগের ভাষা, রোমান্টিক-ক্লাসিক ভাষা ইত্যাদি। এই যে ভাষার বিভিন্ন স্তর এবং বহুভাষাসমন্বিত বাস্তবতা, এটা যদ্দিন ভাষা জীবিত এবং বিকাশমান থাকে তদ্দিন বাড়তেই থাকে। কেন্দ্রমুখী একরৈখিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রাতিগ বলের উপাদানগুলোও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যায়। বাচনিক-মতাদর্শিক কেন্দ্রীভূতকরণ আর একীকরণের পাশেই চলতে থাকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং বহুধাবিভক্তীকরণ।

প্রত্যেক উচ্চারণ স্বভাবতই কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির চিহ্ন বহন করে। ওই উচ্চারণ কেবল নিজের বিচ্ছিন্ন একক প্রয়োজন মেটায় না; হেটারোগ্লসিয়ার যে জগতে তার জন্ম ও অবস্থিতি, তার প্রয়োজনও মেটায়। তার চেয়ে বড় কথা, ভাষাগত অবয়ব আর শৈলীর দিক থেকে উচ্চারণটি একরৈখিক ভাষাকাঠামোর কেন্দ্রমুখী-নির্দেশনা দ্বারা যতটা

প্রভাবিত হয়, হেটারোগ্লসিয়ার প্রভাব তার চেয়ে মোটেই কম নয়। তার মানেই হল, ভাষিক উচ্চারণ একই সাথে একরৈখিক ভাষা আর হেটারোগ্লসিয়া — দুইয়ের যৌথতায় নিষ্পন্ন হয়। যে পরিবেশে উচ্চারণটির জন্ম ও পরিণতি তা সংলাপায়িত (dialogized) হেটারোগ্লসিয়া; ভাষার মতোই তা সামাজিক আর আকারহীন; অন্যদিকে আবার তা মূর্ত, নির্দিষ্ট বার্তাবাহী এবং ব্যক্তিক উচ্চারণের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত।

যখন পুরানা প্রধান সাহিত্যরূপগুলো বিকশিত হচ্ছিল ভাষার একক কেন্দ্রমুখী বাচনিক-মতাদর্শিক রূপের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, তখনি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসম্বলিত গদ্যরূপগুলো বিকশিত হচ্ছিল ভাষার বহুধাবিভক্ত কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে। যখন কাব্যরূপগুলো নিজেদের শানিত করছিল আনুষ্ঠানিক ভাষার 'উঁচু' রূপের সামাজিক-মতাদর্শিক পাটাতনে, সাংস্কৃতিক-জাতীয়-রাজনৈতিক কেন্দ্রায়নের ছত্রছায়ায়, তখন 'নিচু' স্তরের স্থানীয় সংস্কৃতি আর ভাঁড়দের ময়দানে হেটারোগ্লসিয়ার অনুরণন নিত্য পাওয়া যাচ্ছিল। রাস্তার গান, লোককথা, ছোট গল্পগাছায় প্রধান 'ভাষা'-উপভাষা নিত্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছিল। কবি, পণ্ডিত, পুরোহিত, নাইটসহ সকলের 'ভাষা' প্রাণবন্ত ক্রীড়া-কৌতুকের মুখোমুখি হচ্ছিল। ওই ময়দানে কোনো 'সত্য' ভাষার কারবার হতো না। প্যারডিই এর মূল অবলম্বন, যার লক্ষ্য স্ব স্ব যুগের আনুষ্ঠানিক ভাষার বিরোধিতা।

ভাষাতত্ত্ব, শৈলীবিজ্ঞান আর ভাষাদর্শন ভাষার এই কেন্দ্রমুখী প্রবণতার মধ্যেই কাজ করেছে। ভাষার সংলাপায়িত হেটারোগ্লসিয়ার অঙ্গীভূত কেন্দ্রাতিগ প্রবণতাগুলো সবসময়েই উপেক্ষিত থেকেছে। ফলে ভাষার সংলাপায়িত স্বভাব ব্যাখ্যার কোনো সুযোগই এগুলোতে ছিল না। সত্যি বলতে কী, ডিসকোর্সের সাংলাপিক স্বভাব এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বাস্তবতাই আজতক ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিতে আসেনি। শৈলীবিদ্যাও সংলাপকে কোনোপ্রকার পাত্তা দেয়নি। শৈলীবিদ্যা একটি সাহিত্যকর্মকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করে যেনবা এটি বদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ এক রচনা; রচয়িতার স্বগতোক্তি। অন্য উচ্চারণের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই। যদি একটি রচনাকে ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসাবে ভাবা হয়, যার আগে ও পরে অন্য সংলাপ আছে, তাহলে সেই রচনা পাঠের কোনো উপায় শৈলীবিদ্যা নির্দেশ করে না। উপন্যাস হল সংলাপায়িত হেটারোগ্লসিয়ার মূর্ত রূপ। এর পঠন-পাঠনে প্রচলিত শৈলীবিদ্যা বা নন্দনতত্ত্ব যথেষ্ট গণ্য হওয়ার কোনো কারণ নাই।

৮. উপন্যাসের ভাষা

বাখতিন তাঁর বহু-ব্যবহৃত 'ডিসকোর্স' কথাটা প্রয়োগ করেছেন শব্দ, বাক্য বা এমনকি দীর্ঘ কোনো বয়ান বোঝাতে। সামাজিক-মতাদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বোঝাতেও তাঁর রচনায় এর ব্যবহার দুর্লভ নয়। কিন্তু ডিসকোর্সে, উপন্যাসে বা সাধারণভাবে ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান আসলে 'উচ্চারণ' — ঠিক ব্যবহার-মুহূর্তে ভাষার অবস্থা। যে প্রাণবান সমগ্রতায় উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তার বাস্তবতা ধরাই বাখতিনের লক্ষ্য — ভাষার বিশ্লেষণেও, উপন্যাসের পঠনেও। কবিতার ভাষার সাথে তুলনাসূত্রে বাখতিন উপন্যাসের ভাষার এই বিশিষ্টতা বিশ্লেষণ করেছেন।

কোনো জীবিত শব্দই বস্তুর সাথে একক সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে না: শব্দ এবং বস্তুর মাঝে, শব্দ এবং উচ্চারণকারী ব্যক্তির মাঝে 'অন্যে'র জন্য বেশ লম্বা-চওড়া পরিসর থাকে। সেখানে থাকে একই বস্তু-সম্পর্কিত অন্য শব্দ। থাকে অন্য অর্থগত টান বা ঝোঁক। এ কারণেই কোনো উচ্চারণ যখন কোনো কিছুকে নির্দেশ করে, তখন নির্দেশিত বস্তু বা বিষয়টিকে মূল্য বা গুণ-নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে পাওয়া যায় না। এটি আগে থেকেই নানানভাবে চিহ্নিত থাকে। ফলে কোনো উচ্চারণ নির্দেশিতকে নির্দেশ করার কালে ওই নির্দেশিতের সাথে ইতিমধ্যেই সম্পর্কিত একরাশ ধারণার সাথে সংলাপে লিপ্ত হয়। তার কোনোটি বর্জিত হয়, কোনোটি সহায়ক হিসাবে গৃহীত হয়, অন্য কোনো কোনোটি হয়ত সহাবস্থান করে। অর্থাৎ প্রত্যেক উচ্চারণই আসলে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক-মতাদর্শিক বাস্তবতায় বিদ্যমান অসংখ্য সংলাপের ধারাবাহিকতায় অংশ নিতে বাধ্য হয়। কোনো উচ্চারণ চলমান সংলাপের হয় ধারাবাহিকতা, নয়ত সংযোজন —নিরপেক্ষ কোনো অবস্থান সম্ভবপর নয় : '[E]very word is directed toward an *answer* and cannot escape the profound influence of the answering word that it anticipates. ... Such is the situation in any living dialogue.' (Bakhtin, 1994 : 280)

শৈল্পিক গদ্য বিশেষত উপন্যাসে যখন কোনো শব্দ বা উচ্চারণ কোনো বস্তু বা ভাবকে চিহ্নিত করতে চায়, তখন সে বিদ্যমান অসংখ্য অর্থকে আমলে আনে —কোনোটিকে চাপা দেয়, অন্য অনেকগুলোকে উচ্চকিত করে, এবং এভাবে বহুকৌণিক অর্থদীপ্তি লাভ করে। কেবল উপন্যাসেই ভাষা এ ধরনের জটিলতা ও গভীরতা এবং একইসাথে শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ধারণ করতে পারে।

কাব্যিক ভাষায় শব্দ তার নির্দেশিতের সাপেক্ষে অর্থের বৈচিত্র্য তৈরি করে। ভাষাকে বা শব্দকে সে এমনভাবে ব্যবহার করে, যেন এটি অন্য কোনো অর্থ বা মূল্য বা গুণ দ্বারা আগে চিহ্নিত-চিত্রিত হয়নি। ভুলে যাওয়া হয় যে, নানান পরস্পরবিরোধী বাচনিক কর্মকাণ্ড বা হেটোরোগ্লসিয়ার বাস্তবতায় শব্দটি অস্তিত্ববান ছিল। উপন্যাসের লেখক কিন্তু সামাজিক হেটোরোগ্লসিয়ার যে বাস্তবতায় বস্তু বা বিষয়টির নামায়ন-সংজ্ঞায়ন-মূল্যায়ন হয়েছে, তাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। নির্দেশিত বস্তু বা ভাবের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সাথে সাথে তার কাছে চারপাশের সামাজিক হেটোরোগ্লসিয়াও সমান গুরুত্ব পায়। বিচিত্র স্বর আর ধ্বনির মধ্যেই তার কাঙ্ক্ষিত স্বর শোনা যায়। আসলে বিদ্যমান অসংখ্য স্বর বা ধ্বনির উপস্থিতি ছাড়া তার নিজের কাঙ্ক্ষিত স্বরটি সূক্ষ্মতা পায় না; তার কাঙ্ক্ষিত স্বরটি বস্তুত শোনাই যায় না। এই ডায়ালজিক বৈশিষ্ট্য শুধু শৈল্পিক গদ্যের নয়, বরং যে কোনো ডিসকোর্সেরই। কেবল আদমের পক্ষেই পূর্ব মূল্য বা গুণের বিবেচনা না করে শব্দ উচ্চারণ সম্ভব ছিল। ঐতিহাসিক কাল-পরিসরে এই সুবিধা পাওয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কাব্যের ভাষা নিজের প্রকাশক্ষমতা আর কার্যকুশলতার ব্যাপারে কখনো সন্দিহান নয়। সবকিছু প্রকাশেই তার সক্ষমতা। কবি যা কিছু দেখেন, যা বোঝেন বা চিন্তা করেন, তা তাঁর নিজের নিরূপিত ভাষাতেই করেন। প্রকাশের জন্য তাঁর অন্য কারো ভাষার দরকার পড়ে না। কবিতার ভাষা একক ও অন্যনিরপেক্ষ ভাষা, বাইরের কোনো ভাষার উপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। ভাষাজগতের বৈচিত্র্য বা প্রকাশক্ষমতার দিক থেকে বিভিন্ন ভাষার

সমান সক্ষমতার ধারণা কবিতার জগতে অচল। কবি কতগুলো দ্বন্দ্ব বা নিরাময়-অযোগ্য বিবাদ নিয়ে কাজ করছেন, তাতে কিছুই এসে যায় না। তাঁর একক-অবিতর্কিত ডিসকোর্সই সব কিছু প্রকাশ করে। বৈপরীত্য, দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা থাকে বিষয়ে, চিন্তায়, জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায়, অর্থাৎ কবিতার বিষয়বস্তুতে; সেগুলো কাব্যভাষায় প্রবেশ করে না। কবিতায় দ্বিধা-সম্পর্কিত ডিসকোর্সও প্রকাশ করতে হয় এমন ভাষায় যার সম্পর্কে দ্বিধা থাকলে চলে না। তার মানে এ নয় যে কবিতায় অন্য ভাষা বা হেটোরোগ্লসিয়ার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। থাকে। তবে এর সুযোগ অতি নগণ্য। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো বস্তু বা চরিত্র বা বিষয় চিত্রিত করার জন্য অন্য ভাষা ব্যবহৃত হলেও সে ভাষা 'মূল' ভাষার সমতলে সমমর্যাদায় অবস্থান করে না।

জীবনযাপনের ভাষা কখনো একক বা একরৈখিক নয়। এর বহুবিচিত্র দিক বা তল। ভাষার এই যে বিচিত্র গতিবিধি, তা আবার বিশেষভাবে উচ্চারণকারীর অভিপ্রায় আর স্বরভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত। এগুলোকে বাদ দিয়ে ভাষার পাঠ নিছক নিয়ম পাঠের শামিল। বাখতিন বলছেন, এভাবে ভাষাপাঠ অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে ভাষাকে অনুধাবন-বিশ্লেষণ বাস্তব জীবনের বাইরে গিয়ে কারো মনোবিশ্লেষণ করার মতোই হাস্যকর কাজ। তাতে ভাষার বাস্তবতা মোটেই ধরা পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ ভাষা বলে কিছু নেই। প্রত্যেক ভাষাই 'কারো না কারো' ভাষা। শ্রেণি, পেশা, বয়স, স্থান ইত্যাদি নানান ফারাক ভাষাকে কিছুতেই একক অভিধায় তিষ্ঠাতে দেয় না। বিশেষ স্থানিক বা কালিক বাস্তবতায়ও ভাষা পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেক দিনেরই নিজস্ব শ্লোগান আছে। অন্য দিনের সাথে তা কিছুতেই হুবহু মিলবে না। কবিতা এবং উপন্যাস ভাষার এই স্বভাবকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে মোকাবেলা করে : 'Poetry depersonalizes 'days' in language, while prose ...often deliberately intensifies difference between them, gives them embodied representation and dialogically opposes them to one another in unresolvable dialogues. (Bakhtin, 1994 : 291)

ভাষা যখন সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা স্বতন্ত্র ডায়ালেক্টে রূপ নেয়। তার বিন্যাস আলাদা, বিভিন্ন ভাষাকে পারস্পরিক করে তোলার ধরন আলাদা। সেখানে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে না। একাকার হয়ে যায়। বাখতিন উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়েছেন। গ্রামের একজন কৃষক কয়েকটি ভাষা ব্যবহার করে: তার প্রার্থনার ভাষা, গানের ভাষা, সংসারের কথোপকথনের ভাষা, কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখার ভাষা ইত্যাদি। এগুলো সে না মিশিয়েই ব্যবহার করে। আলাদা করে ব্যবহারের সময়ে সে বিশেষ সচেতনও থাকে না। কিন্তু তার এই ভাষাই যখন জাতীয় সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তার রূপান্তর ঘটে। কবিতার ক্ষেত্রে এ রূপান্তরটা এমনভাবে ঘটে যে, ওই কৃষকের কোনো একটা শব্দ বা ভাষাভঙ্গি কবি ব্যবহার করতেও পারেন; কিন্তু তিনি ব্যবহার করবেন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত থেকে সেটিকে আলাদা করে নিয়ে। কবিতার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শব্দটি আমাদের মূল পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সতর্ক করতেও পারে; কিন্তু কবির ডিসকোর্স হিসাবে। 'বাস্তব' পরিপ্রেক্ষিত থেকে যত আলাদা করা যায়, ততই তার ব্যবহারিক সাফল্য। কবিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিশেষভাবে ঘটে ছন্দে সমর্পিত হওয়ার কারণে। উপন্যাস এবং এমনকি

যে কোনো গদ্যরচনা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা উচ্চারণের বাস্তব মুহূর্তকে অনেক বেশি মূল্য দেয়। কথারা সেখানে কথারত ব্যক্তির উচ্চারণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়। এটাই, বাখতিনের মতে, উপন্যাসের মূল ভিত্তি : '...the fundamental condition, that which makes a novel a novel, that which is responsible for its stylistic uniqueness, is the *speaking person and his discourse*.' (Bakhtin, 1994 : 332)

৯. উপন্যাসের ভাষা ও শিল্পরীতির কিছু দিক

উপন্যাসের গঠনশৈলীগত ঐক্য নিষ্পন্ন হয় নিম্নোক্ত উপাদানে (Bakhtin, 1994 : 262) : ক) লেখকের প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক-শৈল্পিক বয়ান; খ) প্রাত্যহিক কথ্যবচনের কেতাদুরস্ত উপস্থাপনা; গ) চিঠি বা ডায়েরির মতো নিম-সাহিত্যবর্গের কেতাদুরস্ত উপস্থাপনা; ঘ) সাহিত্যিক কিন্তু শৈল্পিক নয় এমন নৈতিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, নৃ-বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার; ঙ) চরিত্রগুলোর স্বতন্ত্র বচনের শৈল্পিক উপস্থাপনা।

এই বিচিত্র উপাদান উপন্যাসে শৈল্পিক আকার পায়, সমগ্র উপন্যাসের বৃহত্তর শৈল্পিক কাঠামোর অধীনে বিন্যস্ত হয়, যেখানে সামগ্রিক কাঠামো অন্তর্গত আলাদা কাঠামোগুলোর প্রত্যেকটি থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের সামগ্রিক শৈলীর স্বাতন্ত্র্য অঙ্গীভূত কাঠামোগুলোর সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল, যে কাঠামোগুলো সমগ্রের অধীন, কিন্তু আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেই তারা অবস্থান করে। উপন্যাসের শৈলী খুঁজতে হবে এর অন্তর্গত 'শৈলীগুলো'র নিপুণ সমবায়ে। উপন্যাসের ভাষা এর অন্তর্গত 'ভাষাগুলো'র কুশলী সমন্বয়। চরিত্রগুলোর স্বতন্ত্র বচনই হোক, আর প্রাত্যহিক কথ্যবচনই হোক — উপাদানগুলো প্রথমত এবং প্রত্যক্ষত সম্পর্কিত হবে অন্তর্গত কাঠামোগুলোর সাথে। এ উপাদানগুলোর শাব্দ-আর্থ-বাক্যিক শৈলী চিহ্নিত হবে ওই অন্তর্গত কাঠামোর সাপেক্ষে, যার সাথে এগুলো প্রত্যক্ষত সম্পর্কিত। একই সঙ্গে অন্তর্গত কাঠামোর অংশ হিসাবে থেকেই এগুলো সমগ্রের কাঠামো তৈরি করবে—সমগ্রের মুদ্রা চিহ্নিত করবে; অংশ নেবে সেই প্রক্রিয়ায় যাতে সমগ্র কাঠামোটি একক সামগ্রিকতা পায় আর তাৎপর্য উন্মোচিত হয়। একটি বড় কাঠামোর নিপুণ সমগ্রতার অধীনে প্রায়-স্বাধীন ছোট কাঠামোর সমন্বয় — প্রথাগত শৈলীবিদ্যায় এ বস্তু অচেনা ছিল। ফলে পুরানা পণ্ডিতেরা উপন্যাসের মাহাত্ম্য ধরতে পারেননি। প্রায়শই তাঁদের দু ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে: এক. একজন ঔপন্যাসিকের ভাষার বর্ণনাকে তাঁরা উপন্যাসের ভাষার বর্ণনা বলে চালিয়েছেন; দুই. উপন্যাসের অন্তর্গত কাঠামোগুলোর কোনো একটিকে প্রায়শই বর্ণনা করেছেন উপন্যাসের শৈলী হিসাবে।

উপন্যাস বিচিত্র সামাজিক বচন আর বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিগত বচনের শৈল্পিক গ্রন্থনা। জাতীয় ভাষার অন্তর্গত সামাজিক উপভাষা, গোষ্ঠীভাষা, পেশাগত ভাষিক মুদ্রা, বিভিন্ন সাহিত্যরূপের ভাষা, বিভিন্ন প্রজন্মের ভাষা, উদ্দেশ্যপ্রবণ ভাষা, কর্তৃপক্ষের ভাষা, চালু ভাষা-ফ্যাশনের বিভিন্ন রূপ, প্রতিটি দিন এমনকি প্রতিটি ঘন্টা (প্রত্যেক দিনেরই নিজস্ব শব্দভান্ডার আছে, আছে জোরারোপের জায়গা) বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে ভাষা পয়দা করে — বিশেষ মুহূর্তের এরকম যাবতীয় ভাষাস্তরই উপন্যাসের উপাদান। বিশেষ মুহূর্তে তৈরি হওয়া বিভিন্ন বাচিক বৈচিত্র্য রক্ষা করে, বিভিন্ন ব্যক্তিগত

উচ্চারণের আলাদা মাত্রা নিশ্চিত করে, উপন্যাস তার কাঙ্ক্ষিত প্রতিপাদ্যের সমগ্র ভুবনকেই চিহ্নিত-চিত্রিত করে — সব বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্য দেয়। রচয়িতার বচন, বর্ণনাকারীদের কথা, অঙ্গীভূত বিভিন্ন সাহিত্যরূপ, চরিত্রগুলোর উচ্চারণ — এগুলো উপন্যাসের মৌলিক গাঠনিক উপাদান, যেগুলোর সাহায্যে বহুবাস্তবসমন্বিত-পরিস্থিতি (hetaroglossia) রক্ষিত হয়; এগুলোর প্রতিটি উপাদান বহুবিচিত্র সামাজিক স্বরের উপস্থিতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিত করে। প্রতিটি উপাদানই কমবেশি সংলাপায়িত (dialogized)। উচ্চারণ ও ভাষার মধ্যে বিশিষ্ট সংযোগ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক; বিভিন্ন ভাষা আর উচ্চারণমুদ্রার মধ্যে থিমের যাতায়াত; সামাজিক হেটারোগ্লসিয়ার বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হওয়া; সংলাপায়িত হওয়া — এগুলোই উপন্যাসের শৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন হল, বিভিন্ন উপাদান আর ভাষার সমন্বয়ে রচয়িতার ভূমিকা কী? এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, বাখতিন 'বর্ণনাকারীর ভাষা' (Narrator's language) আর 'রচয়িতার উদ্দেশ্য' (author's intention) এ দুয়ের মধ্যে ফারাক করেন। আসলে বর্ণনাকারীর ভাষাই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করে, আর চরিত্রের ভাষাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কিন্তু এর পেছনে, বাখতিন বারবার সাবধান করেছেন, পাঠক রচয়িতার উদ্দেশ্যের মুখোমুখি হতে থাকবে, যা বর্ণনাকারীর ভাষা থেকে আলাদা। তাহলে লেখকের কর্তৃত্বের প্রশ্নটি কি এখানেও জোরালোই থেকে যাচ্ছে? না। আমরা জানি, বাখতিন প্রত্যক্ষ বয়ান কম পছন্দ করতেন; তাঁর গীতিকবিতা সংক্রান্ত আলোচনায় তা স্পষ্ট। অন্যদিকে আবার বাখতিন কখনোই উদ্দেশ্যহীনতাকে প্রশ্রয় দানকারী চিন্তক নন। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি রচয়িতার উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের মধ্যেই উপন্যাসের শিল্পসত্য নিহিত থাকে না। আসলে বাখতিনের তত্ত্বে উপন্যাসের চূড়ান্ত সত্য কোথাও থাকে না। শেষ কথা বলে কিছু নাই (Dentith, 1996 : 56)।

তাহলে রচয়িতার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, বহুবাস্তবসমন্বিত-বাস্তবতায় বিদ্যমান ভাষাগুলোর জুতসই ইমেজ তৈরি করা এবং এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন তাদের বহুমাত্রিক পারস্পরিকতা সম্ভব হয়। বাখতিনের সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুসরণ নয়, কিন্তু শৈল্পিক বাস্তব আর অনুকৃত বাস্তবের পারস্পরিকতা তাতে রক্ষিত হবে। ঠিক তেমনি উপন্যাসের ভাষাও বাস্তবের ভাষার হুবহু অনুকরণ নয়, বরং 'শৈল্পিক' উপস্থাপনা : '[T]he central problem of the stylistics of the novel may be formulated as the problem of *artistically representing language, the problem of representing the image of a language.*' (Bakhtin, 1994 : 336) ব্যাপারটা বোঝার জন্য চরিত্র প্রসঙ্গে তাঁর তিনটি সাবধানবাণী স্মরণ করা যেতে পারে : ১) উপন্যাসের চরিত্র সবসময়েই কোনো না কোনো মাত্রায় বিশেষ মতাদর্শের ধারক; তার কথা সেই মতাদর্শের পরিচায়ক। তার কথায় বিশেষ জগৎদৃষ্টি প্রকাশিত হয়, যা সামাজিক পরিসরে নিজের অবস্থানের ন্যায্যতার জন্য অন্যদের সাথে লড়াইরত থাকে। ২) উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্র আর তার পরিণতি আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যক্তির ডিসকোর্স গুরুত্বপূর্ণ কেবল এজন্য যে তা সামাজিক স্তরবিন্যাস বা সামাজিক পরিসরের অন্তর্গত

হয়েই উপস্থাপিত হয়, আর এভাবে হেটোরোগ্লসিয়া নিশ্চিত করে। ৩) কথক চরিত্রের কথা উপন্যাসে সরাসরি পুনরুৎপাদিত হয় না। উপস্থাপিত হয় 'শৈল্পিকভাবে'। এক্ষেত্রে নাটকের সাথে উপন্যাসের মূল ফারাক এই যে, উপন্যাসে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত বা পারস্পরিক আলাপ চলে রচয়িতার মধ্যস্থতায়।

Problems of Dostoevsky's Poetics (1999) গ্রন্থে বাখতিন পুরানা কার্নিভাল আর কার্নিভালের ধরনের রচিত লেখালেখির সাথে উপন্যাসকে মিলিয়ে পাঠ করেছেন (Dentith, 1996 : 51-52)। দস্তয়েভস্কি এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শ। অন্যদিকে আছে বর্ণনাকারীর উচ্চারণ-প্রাধান্যে রচিত উপন্যাস। ইউরোপীয় উপন্যাসের এই প্রধান ধারায় এক ধরনের 'সাধারণ ভাষা' ব্যবহৃত হয়। মোটের উপর সেই ভাষা 'সাহিত্যিক ভাষা'র সীমা অতিক্রম করে না। লেখকের নিজের ভাষা — যেমন কোনো বেদনাদীর্ণ অনুভূতি বা প্রকৃতির বর্ণনা — শ্রেণি-পেশা-বর্গভুক্ত ভাষাগুলোর সাথে সমীকৃত হয়ে উপন্যাসের মোট আয়তনটা তৈয়ার করে। কিন্তু এ ধরনের উপন্যাসের ক্ষেত্রেও : 'It is precisely the diversity of speech, and not the unity of a normative shared language, that is the ground of style.' (Bakhtin, 1994 : 308) বর্ণনা চরিত্রও করতে পারে। সেক্ষেত্রে চরিত্রের বয়ান আর লেখকের পরোক্ষ বয়ান একত্রে কাজ করে। বাখতিন একে বলেছেন দ্বিস্বর (double voiced) বয়ান। এর বাইরে উপন্যাসে আসতে পারে ডায়েরি, চিঠি, সংবাদধর্মী বয়ান ইত্যাদি বা কবিতা, গল্প, প্রবাদ-প্রবচনের মতো সাহিত্যরূপ। এগুলো লেখকের অভিপ্রায় দ্বারা প্রতিসৃত হয়ে সংলাপায়িত হয়। যেভাবেই নিষ্পন্ন হোক না কেন, সূক্ষ্ম বিচারে উপন্যাস সবসময় 'অন্যের উচ্চারণ অন্যের ভাষা'য় প্রকাশ করে। রচয়িতার অভিপ্রায় এখানে প্রকাশিত হয় প্রতিসৃত ভঙ্গিতে। এ ধরনের উচ্চারণ বিশেষ ধরনের 'দ্বিস্বর ডিসকোর্স' গঠন করে। প্রত্যক্ষভাবে কথকের স্বর, আর প্রতিসৃত অবস্থায় রচয়িতার স্বর।

উপন্যাসের বহুভাষা মানে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ নয়; বরং ভাষাগুলোর অনন্য শৈল্পিক ব্যবস্থা, যেখানে ভাষাগুলো একই তলে অবস্থান করে না। এমনকি রচয়িতার ভাষাও তাই, অন্যের ভাষা সরাসরি বা অনুকরণমূলকভাবে আত্মসাৎ করেই এর অস্তিত্ব। যে ভাষা রচয়িতার ভাষা বলে মনে হয়, উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে না থাকলেও, স্বরে-সুরে তা অন্যের ভাষাই বটে। এই অর্কেস্ট্রায়িত আর দূরবর্তী ডিসকোর্সগুলোকে লেখকের ডিসকোর্স হিসাবে অবনমিত করা, উপন্যাসের ক্ষেত্রে, খারাপ পাঠ-প্রক্রিয়া। বাখতিন উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, চরিত্রকে জীবন্ত করার জন্য কোনো চরিত্রের মুখে ব্যাকরণগত ভুল ভাষা ব্যবহারের জন্য লেখককে দায়ী করা যে ধরনের ভুল-পাঠ, রচনার অন্তর্গত ডিসকোর্সকে ব্যক্তি-লেখকের জিম্মায় পাঠ করা তেমনি ভুল-পাঠ। অর্কেস্ট্রায়নটা নিঃসন্দেহে লেখকই করেন, আর লেখকের শৈল্পিক উদ্দেশ্যের দ্বারাই এসব উপাদান শেষতক চিহ্নিত ও নির্ধারিত হয়; কিন্তু এগুলো কিছুতেই লেখকের *ভাষা* নয়। পদ্ধতিগতভাবে 'উপন্যাসের ভাষা'-বিশ্লেষণ কথাটার কোনো অর্থ হয় না, কারণ এ ধরনের কিছু আদতে নাই (Bakhtin, 1994 : 416)। বরং উপন্যাসে থাকে ভাষাগুলোর শৈল্পিক গ্রন্থনা, আরো ভালো হয় বললে ভাষাগুলোর ইমেজের শৈল্পিক গ্রন্থনা। ফলে বিশ্লেষণের বিষয় হবে অর্কেস্ট্রায়িত ভাষাগুলোর উন্মোচন, তাদের

অর্থগত ফারাক নির্ধারণ, প্রতিফলিত উদ্দেশ্যের তত্ত্বতালাশ, পরস্পরের সংলাপায়িত সম্পর্ক বোঝা, আর চূড়ান্তভাবে যদি রচয়িতার প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স থাকে যা রচনাটির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান বহুবাস্তবসমন্বিত দুনিয়াকে সংলাপায়িত করে, তা বুঝে ওঠা।

উপন্যাসের সংগঠন আর বিবেচনায় বাখতিন ভাবাদর্শকে (ideology) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, উপন্যাসের পাঠে শৈল্পিক এবং ভাবাদর্শিক বিবেচনা একত্রে কাজ করা দরকার। আর ব্যাপারটা অবশ্যই মূল্যায়নধর্মী হবে; কারণ : '[T]here is no artistic understanding without evalution.' (Bakhtin, 1994 : 416) আরো বলেছেন, যত সূক্ষ্ম হোক না কেন, খাঁটি ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে উপন্যাসে প্রতিফলিত লেখকের উদ্দেশ্যের গতিবিধি এবং ক্রীড়ানৈপুণ্য (play) ধরা অসম্ভব; কারণ কাজটা হয় বিভিন্ন ভাষায়। উপন্যাসের শৈল্পিক এবং ভাবাদর্শিক বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত হবে শৈলীগত বিশ্লেষণ দ্বারা। মনে রাখতে হবে, এগুলো ভাষিক উপাত্ত নয়, ভাষার শিল্পিত ইমেজ। অতীতের এবং অচেনা ভাষার উপন্যাসের ক্ষেত্রে — যে সময় এবং ভাষা আমরা বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না — ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ বেশি কাজে লাগে; যদিও সমসাময়িক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ জ্ঞান সহায়ক হতে পারে।

যুগের সামাজিক-ভাবাদর্শিক ধারা এবং সেগুলোর পারস্পরিকতা সম্পর্কে, অর্থাৎ বাস্তবে সেগুলো যেভাবে বিদ্যমান থাকে সে সম্পর্কে, পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া শুধু শৈলীগত বা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণগত বিবেচনায় উপন্যাসের তল পাওয়া যাবে না।

১০. উপন্যাসের স্থান-কাল : ক্রনোটোপ

বাস্তবের স্থান-কাল কিভাবে উপন্যাসের স্থান-কালে পরিবর্তিত হয়, উপন্যাসে তা কী কাজ করে, আর সাহিত্যের ইতিহাসে তার বিবর্তনের ধরনটিই বা কেমন — এসব নিয়ে বাখতিন আলোচনা করেছেন : 'Forms of time and of the chronotope in the novel : Notes toward a historical poetics' নামের সুদীর্ঘ প্রবন্ধে (Bakhtin, 1994 : 84-258)। তিনি বয়ানের স্থানগত-কালগত অচ্ছেদ্য সম্পর্কের নাম দিয়েছেন 'ক্রনোটোপ'। শব্দটির আক্ষরিক অর্থও বলে দিয়েছেন তিনি — 'স্থান-কাল'। সাহিত্যে স্থানগত আর কালগত নির্ণায়কগুলো পরিকল্পিত বিন্যাসে মূর্তিমান সমগ্রতা লাভ করে। সময় যেন স্পর্শযোগ্য ও দৃশ্যমান হয়ে আকার পেতে থাকে; আর সময়ের চলনের সাথে তাল রেখে, সাড়া দিয়ে, প্লট আর ইতিহাসের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে পরিসরগুলো রূপ পায়। ক্রনোটোপ বয়ানকে মূর্তিমান করে, তাতে রক্তমাংস সঞ্চার করে। একটি ঘটনা নানাভাবে গোচরে আনা যায়। প্রচুর তথ্য দেয়া সম্ভব। সময় ও স্থান সম্পর্কে এবং সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সম্ভব। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ঘটনাটা একাট্টা রূপ পায় না, মূর্তিমান হয় না। ক্রনোটোপই আসলে সেই জাদু, যার মন্ত্রবলে তথ্যপঞ্জি ঘটনা হিসাবে উপস্থাপিত হওয়ার ভিত্তি পায়। শুধু তাই নয়। উপন্যাসের যাবতীয় বিমূর্ত ধারণা, সে দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিকই হোক আর ভাব বা কার্যকারণ সম্পর্কই হোক, ক্রনোটোপকে ঘিরেই আকার লাভ করে; যে ইমেজ শিল্পের প্রকৃত শক্তি, তাকে সম্ভবপর করে তোলে।

বাখতিন সুদূর অতীত থেকে চর্চিত ক্রনোটোপের কয়েকটি প্রধান ধরন ব্যাখ্যা করেছেন। এখানেও তিনি শুরু করেছেন গ্রিক রোমান্স থেকে। এ ধরনের রোমান্সে সময় নায়কের জীবনকে মোটেই প্রভাবিত করে না। সামাজিক-প্রাকৃতিক কোনো বদল না ঘটিয়েই বিশৃঙ্খল সময়প্রবাহের মধ্যে রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা ঘটতে থাকে। পরিসরের ধারণাও থেকে যায় বিমূর্ত। এর নায়ক শুরু থেকেই পূর্ণ মহিমায় বিকশিত। শুধু কিছু ঘটনা নায়কের সততা, সাহস ইত্যাদি গুণের জানান দিয়ে যায়। অ্যাপোলিয়াস ও পেট্রোনিয়াসের 'উপন্যাসে', যেগুলোকে বাখতিন শনাক্ত করেছেন 'প্রাত্যহিক জীবনের রোমাঞ্চকর অভিযানের উপন্যাস' হিসাবে, ক্রনোটোপের অন্য মাত্রা যুক্ত হয়। এখানে পথেই ঘটনা ঘটতে থাকে। এই পথ নায়কের জীবন-পথের সাথে একাকার হয়ে যায়। যেমন, অ্যাপোলিয়াসের *দ্য গোল্ডেন অ্যাস*-এ নায়ক লুসিয়াস গাধায় রূপান্তরিত হয়। মুখোমুখি হয় বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার। অবশেষে পরিশুদ্ধ সত্তায় উন্নীত হওয়ার আগে আগে আবার ফিরে পায় মানুষের রূপ। এই ক্রনোটোপে গ্রিক রোমাঞ্চের নানা লক্ষণ স্পষ্ট; কিন্তু সময়ের গতি যেভাবে চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে যায়, তাতে তাৎপর্যপূর্ণ নতুন মাত্রাও অচিহ্নিত থাকে না। বাখতিন আরো লক্ষ করেছেন, উপাদান সঞ্চয় আর ব্যবহারে এই ঘরানার ক্রনোটোপের সাথে লোকগাথার যোগ অতি নিবিড়।

স্থান-কাল ধারণার প্রেক্ষাপটে বয়ানের পাঠ একদিকে যেমন নতুন, অন্যদিকে তেমনি আকর্ষণীয়। বাখতিন ক্রনোটোপের প্রধান ধরনগুলোর বিবরণ দিয়েছেন। তাতে রচিত হয়েছে উপন্যাসের নতুন ধরনের ইতিহাস। এখানেও সেই একই চরিত্র : সেই গ্রিক 'উপন্যাস' থেকে শুরু করে রেবেলিয়াস পর্যন্ত। তবে প্রতিটি প্রধান ক্রনোটোপের ক্ষেত্রেই আধুনিক ঔপন্যাসিকদেরও মিলিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করেছেন লোকগাথা থেকে পাওয়া বিবর্তিত নানা উপাদানের কথা। রেবেলিয়াসে এসেই, তাঁর মতে, এই বিচিত্র ক্রনোটোপ নতুন রূপে আর পরিকল্পনায় আধুনিক তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য অনেক কারণের সঙ্গে এ কারণেও এই রেনেসাঁ-লেখক তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। আবার রেবেলিয়াসের পক্ষে যে তা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ নিহিত আছে ওই সময়ের মধ্যে। মানুষের স্থান-কাল সম্পর্কিত নব-উদ্ভূত চৈতন্যের মধ্যে। ঠিক এখানেই সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন ধরন প্রস্তাবের বাইরে বাখতিনের ক্রনোটোপ-সম্পর্কিত আলোচনার অন্য সব গভীর তাৎপর্য নিহিত। একদিকে তিনি দেখিয়েছেন, স্থান-কালগত উপাদানের ধরনই বয়ানের সামগ্রিক রূপ নির্ধারণ করে দেয় :

> They are the organizing centers for the fundamental narrative events of the novel. The chronotope is the place where the knots of narrative are tied and untied. It can be said without qualification that to them belongs the meaning that shapes narrative. (Bakhtin, 1994 : 250)

অন্যদিকে, ক্রনোটোপের রূপান্তর মানুষের স্থান-কাল-সম্পর্কিত বোধের রূপান্তরের ফল। বোধের রূপান্তর মানুষের প্রকৃত জীবনধারার পরিবর্তনের ফলেই ঘটে থাকে। বৃহত্তর অর্থে কাঠামোবাদী-মার্কসবাদী প্যারাডাইম থেকে বাখতিন কখনোই চূড়ান্তভাবে বিচ্যুত হননি, যদিও সাংস্কৃতিক উৎপাদনকে পরম মূল্য দিয়েছেন। বর্তমান সময় ও স্থানকে পরম মূল্য

দিয়েও চলমান স্থান-কাল আর লোকজীবনের বিচিত্র উপাদানকে তত্ত্ব-কাঠামোর অঙ্গীভূত করতে পেরেছেন।

১১. কয়েকটি পর্যালোচনামূলক মন্তব্য

এক. উপন্যাসের মতো একটি বহুচর্চিত বিষয়ে বাখতিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল একটি উপন্যাসতত্ত্ব প্রস্তাব করতে পারা। এ ক্ষেত্রে বাখতিন বিমূর্ত 'আকারবাদী' (formal) পাঠের সাথে সমরূপ বিমূর্ত 'মতাদর্শিক' (ideological) পাঠের বিদ্যমান বিচ্ছেদ ঘোচাতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েছেন খোদ সাহিত্যরূপের শৈলীর উপর, বিশেষ সময় বা লেখকের রচনার উপর নয়। তাঁর মতে, সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা কালগত শৈলীর দিকটি গুরুত্ব পাওয়ায় মূল সামাজিক বিবেচনা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সাহিত্যরূপের উদ্ভব-বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের তুলনায় সেগুলোর রূপ-রূপান্তরের গৌণ ইতিবৃত্ত প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলে দার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা না হয়ে শৈলীর মতো তুচ্ছ জিনিসে মনোযোগ বেড়েছে। আদতে শৈল্পিক ডিসকোর্স জন্ম নেয় যে জনপরিসরে, জীবনধারা ও যুগ-পরিক্রমায়, তা ঢাকা পড়ে ব্যক্তিগত শৈলীর কুয়াশায়। ব্যক্তিগত শৈলী বা বিশেষ ধারার শৈলী জায়মান ডিসকোর্সের প্রত্যক্ষ সন্তান নয়, ব্যক্তিগত প্রতিভাবলে তা থেকে সংগৃহীত উপাদানের বিশেষ রূপায়ণ। কিন্তু মূল উৎস থেকে বিচ্যুত হয়ে, অর্থাৎ বাস্তবতার যে ধারা-প্রবাহের মধ্যে তার জন্ম-বিকাশ, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে, তার পাঠ সারল্যদোষে দুষ্ট এবং অতিশয় বিমূর্ত হতে বাধ্য। যার পরিণতিতে শিল্পকর্মের অর্থগত তাৎপর্য অধরা থেকে যাবে।

দুই. বাখতিনের লেখা এবং তত্ত্ব — দুইই জটিল। জটিলতার এক কারণ বিপুল নতুন পরিভাষার ব্যবহার। কিন্তু মূল কারণ : আলোচ্য বিষয়ের বিস্তার। একদিকে তিনি ভাষার বিচিত্র-জটিল বাস্তবতার সাথে তাঁর নন্দনতত্ত্বের সমান্তরলতা তৈরি করেছেন; অন্যদিকে আবার মানুষের যাপিত জীবনের লম্বা ইতিহাস থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। বহুত্বের এক প্রবল-গভীর বোধ তাঁকে ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেছে। তাঁর তত্ত্বে ব্যক্তির তুলনায় সমষ্টির ভূমিকা প্রবল। কিন্তু ব্যক্তির সীমা আর স্বাধীনতা তাতে কখনোই লঙ্ঘিত হয়নি[৩]।

তিন. বাখতিন কাজ করেছেন বিশুদ্ধত ইউরোপের ইতিহাস নিয়ে। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের বাঁকগুলো তিনি সাব্যস্ত করেছেন ইউরোপীয় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই। অবশ্য অ-ইউরোপীয়দের প্রতি তাতে কোনো বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয়নি। প্রগতির ধারণা তাঁর কাছে প্রশ্নহীন নয়, কিন্তু বিজ্ঞান কী মানবিক, যে কোনো 'অগ্রগতি'ই তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন সম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষের কল্যাণে। প্রকল্পের গণমুখিতা তাঁর তত্ত্বীয় অভিযাত্রার অন্যতম কুললক্ষণ। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে গভীর মিল আছে জার্মান তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের। আপাতদৃষ্টিতে যতরকম বিচ্যুতিই থাক না কেন, গভীর অর্থে দুজনই মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। হয়ত আরো ভালো হয় বললে, এঁদের চিন্তায় বুর্জোয়া-লিবারেল দুনিয়ার মানবিক অর্জনের সাথে মার্কসবাদের কার্যকর মেলবন্ধন ঘটেছে।

টীকা

১. বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ দুটি ছাড়াও বাখতিনের নামে অন্তত তিনটি সংকলন ইংরেজিতে বেরিয়েছে : *Art and Answerability : Early Philosophical Essays, Rabelais and His World, Speech Genres and Other Late Essays*। তাছাড়া বাখতিন সার্কেলের অন্যদের নামে বা যৌথভাবে বেরিয়েছে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ : *The Formal Method in Literary Scholarship : A Critical Introduction to Sociological Poetics, Freudianism : A Marxist Critique, Marxism and the Philosophy of Language, Bakhtin School Papers*। উল্লেখ্য, অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, বাখতিন সার্কেলের অন্যদের নামে প্রচলিত রচনাদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাখতিনের রচনা।

২. চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকে পশ্চিমা লিবারেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। বাখতিন এবং দস্তয়েভস্কি দুজনই এ থেকে মেরুদূর। বাখতিনের মতে, একক আলাদা কোনো মানবচৈতন্য কল্পনা করা যায় না, ঠিক যেমন একা ব্যক্তি কোনো ভাষার উৎস হতে পারে না : 'A single consciousness is *contradictio in adjecto.* Consciousness is in essence multiple. *Pluralia tantum.*' (Bakhtin, 1999 : 288) ফলে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস ধ্রুপদী লিবারালিজমের স্বাধীন ব্যক্তিদের বিচরণক্ষেত্র নয়, বরং এদের অনুভূতি বা উপলব্ধ সত্য কেবল অন্যের সত্যের সংস্পর্শেই রূপায়িত হয়ে থাকে। (Dentith, 1996 : 44)

৩. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাখতিনের নিম্নোক্ত মন্তব্য :
বিদ্যমান সামাজিক-ঐতিহাসিক বর্গে কোনো মানুষের পূর্ণ পরিচয় দেয়া যায় না। এমন কোনো সাহিত্যরূপ নেই যেখানে মানুষের সম্ভাবনা ও চাহিদা ট্র্যাজিক-এপিক নায়কের মতো নিঃশেষে উপস্থাপিত হতে পারে। মানবিক বৈশিষ্ট্যের কিছু উপাদান সর্বত্রই বাদ থেকে যাবে। এই বাড়তি মানব-বৈশিষ্ট্যের কিছু দিক লেখকের দৃষ্টিকোণেও ধরা পড়তে পারে, যেমন ঘটেছে গোগলের লেখায়। উপন্যাসে চিত্রিত বাস্তবতা অন্য অসংখ্য সম্ভাব্য বাস্তবতার একটি মাত্র। এটা অনিবার্য নয়, খামখেয়ালিও নয় — তবে এর মধ্যে অন্য সম্ভাবনাগুলোও চিহ্নিত হয়। (Bakhtin, 1994: 37)

গ্রন্থপঞ্জি

Bakhtin, M. M. 1994, *The Dialogic Imagination : Four essays*. Edited by Michael Holquist, Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist, Ninth paperback printing, University of Texas Press, Austin.

Bakhtin, M. M. 1999, *Problems of Dostoevsky's Poetics*, Edited and Translated by Caryl Emerson, Introduction by Wayne C. Booth, Eighth Printing, University of Minnesota Press, Minneapolis, London.

Dentith, Simon 1996, *Bakhtinian Thought: An introductory reader*, reprint, Routledge, London and New York.

Holquist, Michael 1994, 'Introduction', *The Dialogic Imagination: Four essays*, Edited by Michael Holquist, Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist, Ninth paperback printing, University of Texas Press, Austin.

Holquist, Michael 2002, *Dialogism: Bakhtin and his World*, 2nd edition, Routledge, London and New York.

তপোধীর ভট্টাচার্য ১৯৯৬, *বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

দেবেশ রায় ১৯৯১, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) ১৪০৩, *এবং এই সময়*, বাখতিন বিশেষ সংখ্যা, মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, দ্বাদশ বর্ষ, ৩৬তম গ্রীষ্ম সংখ্যা।

[প্রবন্ধটি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে পঠিত]